কৌটা

- আফনান

আমার ছোট খালা বাসা পাল্টাবেন। তাই গেলাম সাহায্য করতে। নতুন বাসায় সব কিছু গোছগাছ করা হচ্ছে। এর মাঝে দেখি খালা হন্যে হয়ে কি জানি খুজছেন।

জিজ্ঞাসা করলে বললেন, একটা কৌটা।

তখন জিনিসপত্রের ঘাট থেকে একটা শাদা কৌটা বের করে নিয়ে বললাম, এটা?

অমনি তিনি ছো মেরে তা নিয়ে নিলেন।

খালার এই রূপ আমার অপরিচিত। প্রচণ্ড কৌতূহল হলো। জিনিসটা কি তা দেখতেই হবে। পরে সুযোগ বুঝে ওনার ট্রাংক থেকে কৌটাটা নিয়ে খুলেই আমি থ। এ যে দুর্গন্ধযুক্ত কিছু চা পাতা! পর মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার শরীরের প্রতিরক্ত বিন্দু থেকে জলকণা এসে চোখে আঘাত করলো। বুঝতে পারলাম কি নিঃসীম বেদনা, কি অপরিসীম ভালোবাসার প্রতীক এই চা পাতাগুলো।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন ছোট। আর খালা এইচএসসি–র মেধাবী ছাত্রী। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, উচ্ছল তরুণী। হঠাৎ শুনলাম খালার বিয়ে হয়ে গেছে। এ তো খুবই খুশির কথা। কিন্তু দেখলাম সবারই মন খারাপ।

পরে শুনেছি খালা কোর্ট ম্যারেজ করেছিলেন। ছেলেটি তখন সবে মেরিন একাডেমি থেকে বেরিয়েছে। খালার থেকে বছর তিনেকের বড়। একই স্কুলে পড়েছিলেন তারা। প্রায় প্রতিষ্ঠিত ছেলে এবং সুন্দরী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিয়ে দুই পরিবারের কেউ–ই মেনে নেয়নি। তবু তাদের সংসার ভালোই চলছিল।

এইচএসসি শেষ করে খালা জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হন। বিয়ের বছর দুয়েকের মাথায় খালাদের প্রথম এবং একমাত্র সন্তান অনিকের জন্ম হয়। তখনো দুই পরিবার তাদেরকে মেনে নেয়নি।

এরই মাঝে খালার জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল। একদিন খবর এলো খালু হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গেছেন। তাকে তার ক্যাবিনের বাথরুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওনার নাকি কখনো প্রেশার ছিল না। তবুও সবাই ধারণা করলো, ইঞ্জিনের গরম থেকে ডিউটি করে এসে মাথায় হঠাৎ ঠাণ্ডা পানি ঢালায় এটা হয়েছে।

এই কঠিন বিপদের সময়ও খালা এবং অনিককে দুই পরিবারের কেউ গ্রহণ করলো না। তবে অনিকের দাদারা তাদের ছেলের সম্পত্তি নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। খালুর সব কিছু তার আম্মার নামে উইল করা ছিল। সেসব খালার নামে ট্রান্সফার করবেন বললেও তার আগেই এমনকি অনিককে না দেখেই তিনি মারা যান। তাই মামলা করলেও খালা ইনশিওরেন্সের ত্রিশ লাখ টাকাসহ অন্যান্য সকল দাবি হারান। ওরা প্রমাণ করে দেয় যে, একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলের মৃত্যুতে তারা খুবই অভাবে পড়েছে।

খালা নিজের ও অনিকের খোরপোষের জন্য যৎসামান্য কিছু টাকা পান। আর সেই সঙ্গে পান এই এক কৌটা চা পাতা যা খালুর লাশকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য দেয়া হয়েছিল।

আমার যতোটুকু মনে পড়ে, তখন অনেকে *গুনাহ হবে, অমঙ্গল হবে* ইত্যাদি বললেও খালা তাদের অগ্রাহ্য করে এই চা পাতা কৌটা ভরে রাখেন। সেই চা পাতাই তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন আজকে প্রায় আট বছর ধরে। খালুর মৃত্যুর পরের কঠিন জীবনে তাহলে এ চা পাতাই ওনার একমাত্র অনুপ্রেরণা হয়েছিল?

আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত। শহরের একটি নামকরা স্কুলে মাস্টারি করেন। কে তাকে মেনে নিল বা না নিল তাতে তার কিছু আর এসে যায় না।

এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার আম্মার সঙ্গে ওনার ছোটবেলা থেকেই খুব ভাব ছিল বলে আম্মা নিজের বিয়ের পর ওনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

কেউ দেখার আগেই কৌটাটি আমি যথাস্থানে রেখে দিই।

মনিপুরিপাড়া, ঢাকা থেকে

পিতৃতুল্য

– রনি

১৯৯২ সালের ১০ জুন। দেশ রক্ষা ও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একজন গর্বিত অফিসার হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে বিএমএ–তে যোগ দিই।

বিএমএ–এর ভয়াবহ অভ্যর্থনার পর রাত দুইটা বা তারও পর অর্ধমৃত অবস্থায় জাহাঙ্গীর কম্পানির চারতলার নিজের জন্য বরাদ্দ কোণার রুমে ঢুকে নিজের ঘাম ও কাদায় ভেজা ছেড়া শার্ট, প্যান্ট খুলতে ব্যালকনিতে দাড়াই। তখন দূরের আকাবাকা পাহাড়ি রাস্তা ও পাহাড়ের সারি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছিল না।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দূরে রাস্তার ধারে মিটি মিটি আলো জ্বলছে একটি চায়ের দোকানে। দোকানের নাম *গরিবে নেওয়াজ টি স্টল*।

আমার মনে হঠাৎ সন্দেহ হলো, এতো রাতে চায়ের দোকান খোলা কেন?

যাহোক, মাথায় এতো চিন্তা যে, ওই টি স্টলের চিন্তা করার সময় আমার ছিল না।

তারপরও বিভিন্ন সময় রাতে যখন পড়াশোনা শেষ করে ব্যালকনিতে বসতাম তখন দেখতাম ওই বৃদ্ধ লোকটি একাকী চা স্টল খুলে বসে আছে। মাঝে মধ্যে যখন দল বেধে ওই রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে যেতাম তখন ওই বৃদ্ধের নির্লিপ্ত চোখের সঙ্গে প্রায়ই চোখাচোখি হতো। বিএমএ–এর কঠিন বন্দী জীবনে ওই বেসামরিক বৃদ্ধ চা স্টলের মালিকই ছিল আমার প্রতিরাতের দূরের সঙ্গী।

যখন তৃতীয় টার্মে উঠলাম তখন একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম। গহীন রাতে দেয়াল পেরিয়ে যদি কোনো ক্যাডেট ওই টি স্টলে যায়, যতো রাতই হোক, ওই টি স্টলের চা তার জন্য ফ্রি। যদিও দশ বারোজন প্রচণ্ড দুঃসাহসী ক্যাডেট ছাড়া কেউ–ই সে চা স্টলের পা বাড়াতো না বিএমএ থেকে বহিষ্কারের ভয়ে।

মনে প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও কখনো ওই টি স্টলের চা খাওয়া হয়নি। ভেবেছি অফিসার হয়ে তবেই খাবো। পাসিং আউট প্যারেড–এর পরে চট্টগ্রাম থেকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন স্থানে চাকরি করলেও চট্টগ্রাম আর যাওয়া হয়নি।

এই কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম বেড়াতে এসে হঠাৎই আমি, জেনি ও আমার ছেলে রাইয়ান মিলে ওই চা স্টলে চা খেতে যাই। আশ্চর্য, সেই বৃদ্ধ এখনো সেই চায়ের দোকানে বসে আছেন! বার্ধক্য তার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই বিনা পয়সায় চা খাওয়ানোর কথা।

তিনি যে কথা বললেন তার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। ওনার কাছে শুনলাম, ওনার ছেলে আইএসএসবি পরীক্ষা দিয়ে সফল হয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু আর ঘরে ফেরেনি। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মের জন্য কোনোদিনই সে পৃথিবীতে আসবে না। বৃদ্ধ সেই থেকে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিএমএ–র সকল ক্যাডেটকেই নিজ সন্তানরূপে দেখেন।

চলে আসার সময় চায়ের দাম দিতে গেলে বলেন, বাজান, বাপ কি কখনো ছেলের কাছ থেকে পয়সা নেয়?

জীবনে দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় অনেক রকম চা খেয়েছি। কিন্তু সেই পিতৃতুল্য বৃদ্ধের হাতের চায়ের স্বাদ আজও ভুলতে পারি না।

সেনানিবাস থেকে

সরোজিত দাশ

আমি একটি চা রিসার্চ সেন্টারে কাজ করি। আমাকে এই প্রতিষ্ঠানে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডি পাঠ সবই করতে হয়। কখনো আমি এখানে টি বয়, কখনো মার্কেটিং অফিসার আবার কখনো রিসার্চ সহকারী। বর্তমানে সহকারী হিসেবে নানান প্রকার কাজ ও মার্কেট সার্চিংয়ে আমাকে যেতে হয়।

মূলত আমার কাজ, বসকে সাহায্য করা। তিনি যা বলবেন সেটি মনে রাখা এবং চাপায়ীদের খুটিনাটি নজর রেখে রাতে রিপোর্ট তৈরি করে সময় মতো বসকে সাহায্য করা। বস সময় মতো সেগুলো এমডি-র কাছে পাঠান। চা বিক্রির ফরমুলা তৈরি করা এবং মানুষকে আরো বেশি হারে চা পানে আগ্রহী করে তোলা আমাদের এখন প্রধান কাজ।

ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ের দিন আমাকে টি বয় হিসেবে কাজ করতে হয়। বস এ সময় আমাকে পাশে রাখেন। প্রথমে চা পানের ইতিহাস দিয়ে মিটিং শুরু হয় আর চায়ের ভবিষ্যৎ দিয়ে মিটিং শেষ হয়।

ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে চলে গেছে। ফেলে গেছে কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং চাখোর লোকজন। আমরা এখন সেই চাখোরদের বর্তমান প্রজন্ম। এখন মেট্রপলিটান শহর থেকে শুরু করে গণ্ড গ্রামেও চায়ের প্রচলন যথানিয়মে চা ব্যবসায়ীদের আরো মনোযোগী করে তুলেছে। গত শীত মরসুমের আগে আমাদের বার্ষিক কনফারেন্স হয়ে গেল। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল চা পানে আরো মানুষকে আগ্রহী করে তোলা।

আমাদের প্রধান বক্তা মিরাজুল হাসান। তিনি তার রিপোর্ট পেশ করলেন।

বাংলাদেশে প্রায় চোদ্দ কোটি লোক বাস করে। তার মধ্যে যদি পঞ্চাশ শতাংশ লোক চাপায়ী হয় তাহলে প্রতিদিন সাত কোটি লোক চা পান করে।

চাপায়ীরা অনেক শ্রেণীর হয়। লাল চা, দুধ চা, লেবু চা, লিকার চা, মিক্সশ্চার চা ইত্যাদি। দোকানদার ক্রেতার শখ ও মর্জি অনুযায়ী চা পরিবেশন করে। এখানে চা পানের আসল রহস্য নিহিত।

মিরাজুল হাসান এমনভাবে তার ব্যাগ থেকে আরেকটি রিপোর্ট সন্তর্পণে বের করলেন যেন তিনি সদ্য পারমাণবিক বোমার ফরমুলা অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করছেন।

বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে এমডিসহ সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, উপস্থিত এমডিসহ সভ্যবৃন্দ। আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছি। মেট্রপলিটান শহর, জেলা শহর, উপজেলা ও গ্রাম প্রত্যেক এলাকায় চা পান ভিন্ন প্রকৃতির।

মেট্রপলিটান শহরগুলো ব্যস্ততাপূর্ণ। এখানে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় প্রায় লোক চা পান করে।

জেলা শহরে সকাল ও সন্ধ্যায় মানুষ বেশি চা পান করে। উপজেলা পর্যায়ে সকালে চা বিক্রি হয় আশি শতাংশ এবং বিকেলে হয় বিশ শতাংশ। কারণ উপজেলা এলাকায় সকালে কাজের জন্য বেশি লোক সমাগম হয়।

কিন্তু গ্রাম এলাকায় ভিন্ন চিত্র। এখানে সন্ধ্যার পর থেকে এক দুই ঘণ্টা চা দোকানদারদের চা বিক্রির সোনার সময়। সারা দিন মাঠে-ঘাটে কাজ করে সন্ধ্যায় বাজারে এসে চা সিগারেট পান করে বাড়িমুখো হয়।

মিরাজুল হাসানের দিকে মৃদু হেসে এমডি বললেন, আপনার এই রিপোর্টে শুধু তথ্য আছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কোথায়! কিভাবে চায়ের প্রতি মানুষের আরো আকর্ষণ বাড়ানো যায় সেই তথ্য কেউ কি জানাতে পারবেন?

সুদর্শন ম্যাথমেটিকসে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটস পার্থ সান্যাল তার রিপোর্ট নিয়ে এমডির দিকে ফিরে তাকালেন। এই সদ্য পাস করা ইউনিভার্সিটির যুবকটির প্রতি সকলের মতো এমডিরও দৃষ্টি পড়েছে। এমডি পার্থ সান্যালের রিপোর্টের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

পার্থ সান্যাল জানালেন, চা পানে পুরুষরা অনেক এগিয়ে। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা চা পানে অনেক পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশে পুরুষ-নারী ১০৩-১০০, সেখানে চাপায়ী-পুরুষ ও নারীর অনুপাত অনেক অনেক কম। কারণ নারীদের চা পানের প্রতি আগ্রহী করা হয়নি।

এখন থেকে মেয়ে দেখার সময় মেয়েদেরকে পানের বাটা কিংবা মিষ্টির প্লেটের পরিবর্তে চায়ের ট্রে নিয়ে যেতে হবে। বছরে প্রায় মোট জনসংখ্যার পনেরো শতাংশ লোক বিয়ের সঙ্গে জড়িত। বিয়েবাড়িতে মিষ্টির আগে দিতে হবে চা।

পলিটিশিয়ানরা চায়ের তুলনায় সিগারেট বেশি খান। তাদের বোঝানো দরকার, ধূমপান করলে আমরা আমাদের এ নেতাদের অচিরেই হারাতে পারি। প্রত্যেক মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যানরা যদি তাদের বক্তৃতায় অন্তত একবার চা পানের উপকারিতা বলেন তাহলে চায়ের বিক্রি বাড়বে বিশ শতাংশ।

সবচেয়ে চা বিক্রির হার বাড়বে যদি দেশের রেজিস্ট্রেশনকৃত ডাক্তার, ক্লিনিক এবং গ্রামের ডাক্তাররা তাদের প্রেসকৃপশনে রোগীদের চা পানের কথা উল্লেখ করেন। আজকের মেডিকাল কলেজের ছাত্ররা আগামী দিনের হবু ডাক্তার। এখন এই হবু ডাক্তারদের প্রতি মাসে যদি কিছু কিছু স্টাইপেন্ড (ছাত্র বৃত্তি)-এর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আগামীতে আমাদের বিক্রি বহুগুণে বেড়ে যাবে।

প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার দুইশ ডাক্তার পাস করে বের হন। প্রতিটি ডাক্তার যদি কমপক্ষে দশজন রোগীকে দিনে দুই কাপ চা পান করতে বলেন তাহলে প্রতিদিন ১,২০০×১০×২ = চব্বিশ হাজার কাপ চা বিক্রি হবে। চা খাওয়াটা সংক্রামক। একা চা পান করা যায় না। প্রতি দুইজনে যদি তার সঙ্গে একজনকে চা পান করায় তাহলে আরো বারো হাজার কাপ চা বোনাস বিক্রি হবে।

এক নিঃশ্বাসে পার্থ তার রিপোর্ট পেশ করলেন।

এমডি এবার স্বর্গীয় হাসি হাসলেন।

হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে এমডি বললেন, পার্থবাবুর অ্যাসিস্টান্ট এ ব্যাপারে কি চিন্তা-ভাবনা করছে।

কম্পিত বক্ষে মৃদু স্বরে চেয়ার থেকে পশ্চাৎদেশ একটু উচু করে কেবল বলতে গেলাম, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আমাদের সবাইকে একযোগে চা পান করতে হবে।

এমডি আমাকে বসে বসে রিপোর্ট পড়তে বললেন।

আমার রিপোর্টের বক্তব্য, এই চা পানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে কলেজ ছাত্ররা। যদি কলেজে ঢোকার পথে এক কাপ এবং কলেজ থেকে বের হয়ে এক কাপ চা পান করে তাহলে প্রায় প্রতিদিন দুই কোটি কাপ চা, মাসে ষাট কোটি কাপ চা বিক্রি হবে।

এসব ছাত্রদের আবার বিশ শতাংশ কোথাও না কোথাও প্রাইভেট টিউশনি করে। সেখানে যদি টাকার সঙ্গে ফ্রি এক কাপ চা দাবি করে তাহলে মাসে ২,০০,০০,০০০$\times \frac{১৫}{১০০} \times$ ৩০= নয় কোটি কাপ চা বোনাস বিক্রি হবে।

বাংলাদেশে মাথাপিছু সন্তানের হার তিন। বাংলাদেশে প্রায় সাত কোটি মহিলা। এদের মধ্যে যদি দশ শতাংশ মহিলা সন্তান প্রসব করে এবং প্রতিবার সন্তান প্রসব করার পর মাকে এক কাপ এবং সন্তানের এক কাপ চা পান করানো যায় তাহলে চা বিক্রির হার আমাদের অনেক বেড়ে যাবে। সংখ্যাটি আমি পরবর্তী বোর্ড মিটিংয়ে জানাবো বলে অঙ্গীকার করলাম।

মিটিং শেষে এমডি তার ব্যক্তিগত সচিবকে ডেকে আমার প্রমোশন স্বরূপ মার্কেটিং অফিসার পদে স্থায়ী নিয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সুপারিশ করে গেলেন।

আশাশুনি, সাতক্ষীরা থেকে

হাং হুং সাই

- পিয়াল মাহমুদ শাকিল

অনেক দিন পর আমার এক প্রাইমারি শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা। হাবিব স্যার। আমি যে দোকানে সেলসম্যানের চাকরি করি সেই দোকানে একটা বেবিসুট কিনতে এসেছেন স্যার। কুশলাদি বিনিময়ের মধ্যেই মাল বিক্রি করেছি স্যারের কাছে। বিদায় নেয়ার সময় বললাম, স্যার, চা খেয়ে যান।

আমাদের সেলসম্যানদের কিছু বিষয় আছে যেমন পরিচিত-অপরিচিতি যেই হোক না কেন, তার কাছে মাল বিক্রি করতে পারলেই তবে চা কিংবা ঠাণ্ডা কিছু পানের অফার করি, বেচা-বিক্রির আগে নয়। তাছাড়া চা, কোক ইত্যাদি বরাদ্দ করতে হয় লভ্যাংশের ওপর নির্ভর করে। লাভ কম হলে পান অথবা সর্বোচ্চ চা। আর বেশি লাভ হলে কোক বা ঠাণ্ডা জাতীয় কিছু।

এছাড়াও আরো কিছু সাংকেতিক ভাষা আমাদের ব্যবহার করতে হয়। যেমন দুই তিনজন ক্রেতা বা বন্ধু-বান্ধব এলে দোকানের পিচ্চিকে বলি, এই হাং চায়ের অর্ডার দিয়ে এসো।

হাং হলো সাংকেতিক ভাষা, হাং মানে একটা, *চা হুং* মানে দুইটা চা। *সাই* মানে দুয়ের অধিক। চাওয়ালা যখন একটা চা দোকানে দিয়ে যায় তখন পিচ্চিকে ধমকাই, কিরে, তোকে একটা চায়ের কথা বলেছি?

এ রকম প্রশ্ন করে অপেক্ষায় থাকি দেখি তারা আর লাগবে না বা এ জাতীয় কোনো কথা বলে কি না। যদি তেমন কিছু না বলে তবে পিচ্চিকে আরো দুটো চায়ের অর্ডার দিতে বলি। এক্ষেত্রে হয় পিচ্চি এসে বলবে, লিকার শেষ, চা দিতে দেরি হবে অথবা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে সে আর দোকানের ধারে কাছেও আসবে না। এগুলো সবই আমাদের আগে থেকে ট্রেনিং দেয়া।

মাফ করবেন ক্রেতা ভাইয়েরা, এসব আমরা ইচ্ছা করে করিনি, আমরা শুধু মালিকের অর্ডারেই এসব ছলচাতুরির আশ্রয় নিই।

এ রকম করা কারোরই উচিত নয়। কারণ দেখা গেছে, একটা কিংবা দুটো চায়ের খরচ বাচাতে গিয়ে অনেক ক্রেতা হারিয়ে ফেলতে হয়।

যাহোক, হাবিব স্যারকে চায়ের কথা বলতেই স্যার বসেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয় ভাব। দ্রুত চা এনে স্যারকে দেয়া হলো। স্যার মাগরিবের নামাজ পড়বেন।

স্যার চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেললেন অর্থাৎ চায়ে চিনি দেয়া হয়নি।

ধমক দিয়ে তাড়াতাড়ি আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে বললাম।

চা এলোও দ্রুত। আবার সেই আগের কেস অর্থাৎ এবারও চায়ে চিনি দিতে ভুল হয়েছে চা বিক্রেতার।

চাওয়ালার চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করে তৃতীয়বারের মতো চায়ের অর্ডার দিই।

স্যার না না বলছেন।

আমার আতে ঘা লাগছে। চা স্যারকে খাওয়াবোই। এক ধরনের জেদ চেপেছে মনে।

ওই দিকে স্যারের মাগরিবের নামাজ শুরু হবে হবে ভাব।

আমি লজ্জিত ভঙ্গিতে এবং স্যার বিরক্তির ভঙ্গিতে বসে আছি চায়ের অপেক্ষায়।

তৃতীয়বারের মতো চা এলো এবং স্যার ধীরে ধীরে কাপের অর্ধেক চা পান করলেন।

তৃপ্ত স্যারকে শেষ পর্যন্ত চা পান করাতে পারলাম।

যাবার সময়ে স্যার বললেন, শাকিল এ চায়েও চিনি দেয়নি ফাজিল চাওয়ালা।

আমি কিংকতর্ব্যবিমূঢ়।

ভোলা থেকে

কয়েকটি স্মৃতি

- মৌমিতা

এক.

আমাদের বাসায় একদিন আমার ভাইয়ার এক বন্ধু এসে হাজির।

মা বললেন, চা বানাও।

আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। সব জায়গায় আমার ভালো চা বানানোর সুনাম আছে। চা বানাচ্ছি। চা নিয়ে এলাম। চা আসলেই ভালো হয়েছে। কালার দেখেই চায়ের স্বাদ বলে দিতে পারি। ভাইয়ার বন্ধুকে চা দিচ্ছি। বললাম, চা খান।

তিনি বললেন, তুমি আগে নাও।

চায়ের কাপটা ধরছেন না।

বললাম, আপনি আগে ধরেন। হঠাৎ দেখি আমার হাত কাপছে। পরে ধমক দিয়ে বললাম, ধরেন তো। আরেকটু হলেই তার কাপড়–চোপড় নষ্ট হয়ে যেতো চা পড়ে।

চা খাচ্ছি সবাই মিলে।

ভাইয়ার বন্ধু বলে কি, চা তো ভালো হয়েছে। কিন্তু লবণ কম হয়েছে।

দুই.

আমার বড় ফুপুর ছোট ছেলে বয়সে আমার এক বছরের বড়। সব সময় আমার সঙ্গে তার ঝগড়া–ঝাটি, হাসি–ঠাট্টা লেগেই থাকে। একদিন চা বানিয়ে এনেছি।

ও বলে, তোর বানানো চা খাবো না।

আমি বললাম চা না খেলে কিছু হবে না।

ওমা! কিছুক্ষণ পর দেখি, যে চা–ই খাবে না সে একাই দুই কাপ চা খেয়ে ফেলছে।

তিন.

ফুপাতো ভাই আর আমি। আমরা দুজন চা বানাচ্ছি। আমাদের বাসায় ওর সঙ্গে ওর মা–বাবাও এসেছে। আমরা চা বানাচ্ছি পাচজনের জন্য। আমি চায়ের পানি দিলাম আর ও চাপাতা দিল। ছয় চামচ চাপাতা দিল। ও নাকি জন হিসেবে চা চামচ দিয়ে চাপাতা দেয়।

সবারটার মধ্যে দুধ চিনি কম দিল। একটার মধ্যে বেশি দিল। বলে, এটা আমার কাপ।

বললাম, ফুপাও তো দুধ চিনি বেশি খান।

রান্নাঘরে থেকে চালাকি করে ওকে আগে যেতে বললাম। তারপর আমি ওর কাপটা সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু ও খাওয়ার সময় ধরতেই পারলো না যে, আমি কাপটা সরিয়েছিলাম। ও এতো বোকা।

চার.

ছুটির দিনে একদিন এক আন্টির বাসায় বেড়াতে গেলাম।

আন্টি চা বিস্কিট দিলেন। বিস্কিট খেয়ে যেই চায়ে মুখ লাগিয়েছি অমনি জিভ গেল পুড়ে। কাউকে বললাম না। ওই আন্টির বাসায় গেলে আগে বলতাম, আন্টি একটি চামচ নিয়ে আসেন। তারপরও আমার ওই আন্টির বাসায় চা খেতে গেলে জিভ পুড়ে যেতো। তাই মাঝে মধ্যে আন্টির বাসায় গেলেও চা খেতাম না।

ময়মনসিংহ থেকে

ম্যানেজার

- রুমেন আলম

ছোটবেলায় পাখির ডাকে কিংবা আজানের সুরে খুব কম দিনই ঘুম ভাঙতো। যার ডাক, চিৎকারে ঘুম ভাঙতো তিনি আমার মা। যে বিষয়টি নিয়ে চিৎকার তা হলো চা খাওয়া নিয়ে। তার ধারণা, আমাদের কেউ আর এ ব্যাপারটায় আমল দিতে চাই না। বাবা তো আরো বেশি উদাসীন।

তিনি চাইতেন মা চা খাওয়া ছেড়ে দিন।

মায়ের চিৎকারটা হয় ভয়াবহ যখন দেখেন চায়ের কৌটাতে চা নেই কিংবা চিনির কৌটাতে চিনি নেই অথবা ছায়াবাক–এর মা দুধ দিয়ে যায়নি।

নিত্যদিনের এই চা খাওয়া নিয়ে অব্যবস্থায় দুঃখ পেতেন এবং পরিশেষে আচলে মুখ ঢেকে কান্নাকাটি করতেন।

এ ব্যাপারগুলো আমাকে খুব ব্যথিত করে তুলতো। ভাবতাম বড় হয়ে চা বাগানের ম্যানেজার হবো। হয়ে মাকে চা পাঠাতে পারবো। আর মাও বেশি বেশি করে চা খেতে পারবেন।

অবশেষে চা বাগানের ম্যানেজার হতে পারিনি বটে, এক চাপাবাজ কম্পানির বড় ম্যানেজার হয়েছি।

আর সে থেকে আজ প্রায় এগারো বছর যাবৎ মায়ের চা খাওয়ার সমস্যা হয়নি।

বনানী, ঢাকা থেকে

চা বাগানে

- আরএ জামাল

বেশি রাতে বৃষ্টির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। নিঃশব্দ এ জীবনে এমন বৃষ্টি নিঃসঙ্গতাকে আরো গাঢ় করে। মনে হচ্ছে কে যেন দরজা ধাককাচ্ছে। হ্যা, ওই তো, সত্যিই তো কে যেন দরজায় জোরে জোরে থাপ্পড় দিচ্ছে। আমি চমকে উঠি।

কে?

আমি। ফ্যাসফ্যাসে গলায় উত্তর এলো।

আমি কে?

আমি কমলা।

এতো রাতে কি জন্য এসেছো?

আশ্রয় চাই বাবু। একটু আশ্রয়।

এতো রাতে দরজা খুলতে পারবো না। তুমি অন্য কোথাও যাও।

কোথায় যাবো বাবু ঝড়–বাদলের রাতে? আপনার এ বাংলো ছাড়া তো দুই তিন মাইলের মধ্যে কোনো ঘর বাড়ি নেই।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন বাবু, ওরা এদিকেই আসছে। বাবু আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে বাচান!

এতো জোরে দরজা ঠেলছে যেন এক্ষুনি দরজাটা ভেঙে যাবে। আমার মনে হচ্ছে বাইরে মেয়েটা শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দরজা ভাঙতে চাইছে।

আমি উঠবো উঠবো করে উঠছি না। ব্যাপারটা কি বুঝতে চেষ্টা করছি। কমলা মেয়েটিকে কোনো দিন দেখিওনি। শুনেছি মেয়েটি নাকি সুন্দরী। এ চা বাগানেই কাজ করে। শুনেছি আমাদের চা বাগানের কোনো এক লম্পট কর্মকর্তা মেয়েটিকে বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে মেয়েটির সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। এতোদিন ব্যাপারটি

গোপন ছিল। কিছুদিন আগে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ব্যাপারটি রাষ্ট্র হয়ে যায়। এখন বিয়ে করা তো দূরের কথা, মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাই অস্বীকার করে। কমলার মতো আরো দুই চারজন সর্বস্ব খোয়ানো মেয়ে মানুষ আছে এই বাগানে যারা ওই লম্পট নারীলোভীর প্রতারণার শিকার হয়েছে।

কিন্তু চাকরি হারানোর ভয়ে কেউই মুখ খোলেনি।

হতভাগ্য কমলার বাবা দীন দয়াল সেদিন অফিসে এসে আমার পা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিচার চায়।

আমি নিচু পদের এক কর্মকর্তা, আমি কি পারি আমার উপরের স্তরের কর্মকর্তার বিচার করতে?

দীন দয়াল এসব বুঝতে চায় না। আমার কাছে এসেছে। নিরুপায় হয়ে কলকাতা হেড অফিসে বড়কর্তা বাবুর কাছে স্ববিস্তারে জানিয়ে পত্র লিখি। পূর্বাপুর অন্যান্য কর্মকাণ্ডও উল্লেখ করি। এবং এখানকার ম্যানেজারের কাছে একখানা আর্জি নিজে লিখে দিই যেন কমলা, তার বাবা ও অন্যান্য নির্যাতিতা মহিলা শ্রমিক নিয়ে গিয়ে আর্জিখানা পেশ করে। বিচার চায়।

তারা সে মতে কাজ করে। এতেই কাজ হয়। লম্পট নারীভোগী শ্রীনাথ বাবু সাময়িক বরখাস্ত হয়।

এতো সব কিছুর মূল হোতা যে আমি সে কথা শ্রীনাথ বাবু জানতে পেরে আমাকে শাসিয়ে যায়। আর যদি বেশি বাড়াবাড়ি করি তাহলে কমলা তো মরবেই, সঙ্গে তোকেও পরপারে পাঠিয়ে দেবো।

সেই থেকেই কমলা ও তার পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমিও আর কোনো খোজ করতে পারিনি। কাজের চাপে ব্যস্ত ছিলাম।

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এলাকা বর্ষাপ্রধান এলাকা। বৃষ্টি শুরু হলে একটানা সাত দিন পর্যন্ত ঝরতে থাকে বিরামহীনভাবে। পথ-ঘাট, নদী-নালা ভরে উঠছে। ঘর ছেড়ে বের হওয়ার জো থাকে না। মাঝে মধ্যে কম্পানির গাড়ি এসে অফিসে নিয়ে যায়।

আজ দুই দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে একদম মুষলধারে। মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিদিনের রোজনামচা লিখে শুয়ে পড়েছি। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। খুব জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে।

বাবু, বাবু দরজা খুলুন। তাড়াতাড়ি খুলুন! ওরা এদিকেই আসছে।

আমি ভাবলাম ওরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্র করছে না তো? মেয়েটাকে ইচ্ছা করে এই ঘোর বর্ষার রাতে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে ফাসাতে চাইছে না তো? এ রকম হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এসব চা বাগানের মানুষ। মেয়েমানুষের দ্বারা সব কিছু সম্ভব। সুচতুর শ্রীনাথ বাবুই হয়তো টাকা পয়সা দিয়ে এ ষড়যন্ত্র করেছেন।

বাবু, আপনার পায়ে পড়ি দয়া করে দরজাটা খুলুন, আমাকে বাচান। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!

এমন জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে দরজা, বুঝি এখনি ভেঙে যাবে।

বললাম, এতো রাতে দরজা খুলতে পারবো না। তুমি অন্য কোথাও যাও।

বাবু, আপনার এ দোতলা বাংলো ছাড়া আশপাশে কোনো বাড়িঘর তো নেই বাবু।

দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে ক্লান্ত হয়ে মেয়েটা গুমরে গুমরে কাদছে। মিনতি তার বর্ষার জলের মতো অস্থানে ঝরতে থাকে। এক সময় সব বন্ধ হয়ে যায়। কানে শুধু আসতে থাকে বৃষ্টির শব্দ রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম। আমিও রাতের নিস্তব্ধতার মতো নিশ্চুপ থাকি।

কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলেই স্তব্ধ হয়ে যাই। মাথা ভূমিতে নুইয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে কমলা মরে আছে।

আমি চিৎকার করে জ্ঞান হারাই।

নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। আমার অবহেলায় মেয়েটি মারা গেছে। মারা গেছে পেটের নিষ্পাপ সন্তানটিও। কি হতো অসহায় মেয়েটিকে যদি আশ্রয় দিতাম? ষড়যন্ত্র যদি তারা করেই থাকতো, কি হতো ফলাফল?

মেয়েটিকে বিয়ে করতে হতো? তার সন্তানের বৈধতা হতো? এর বেশি আর কি হতো? মেয়েটা তো বেচে যেতো। শাস্তিস্বরূপ আজও একা আছি, বিয়ে করিনি।

সে কতোকাল আগের কথা। চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি দশ বছর হলো। কলকাতায় বসবাস করেছি। এখনো ঘন ঘোর বর্ষা রাত এলে হ্যালুসিনেশনে ভুগি।

আজও ঘুম থেকে উঠি দরজা কড়া নাড়ার শব্দে। মন বিভ্রান্ত হয়। কান বিভ্রান্ত হয়। আজও কানে বাজে সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর।

আমি কমলা, তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।

আমি প্রায় ছুটে এসে দরজা খুলি। কেউ নেই, বাইরে গাঢ় অন্ধকার। নীরবতা। এই অন্ধকারেই দেখতে পাই চা বাগানের সেই দিনগুলোকে। বর্ষণমুখর রাতে অমনি করে শুনতে পাই কড়া নাড়ার শব্দ।

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

গচ্চা

- শ্যামল রায়

বিশ্বায়নের যুগে পশু হয়েছে মুক্ত, মানুষ হয়েছে বন্দী। এখন এ দৃশ্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। ব্যাংককেও আলাদা নয়। সাফারিতে আছে সব ধরনের জীবজন্তু। মানুষ নিরাপদ দূরত্বে গাড়িতে।

সাফারি দেখে সোজা ট্যাকসি নিয়ে পাতায়া সমুদ্রসৈকত। গভীর নীল জল। সঙ্গে ভাগ্নে রাজ। অসুস্থ ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করে চলেছি এক দুঃসাহসিক গোপন অভিযানে।

সমগ্র থাইবাসী আহার করে হোটেল বা রেস্তরায়। পেটে তখন আমাদের ইদুর ডন কষছে। এক ইনডিয়ান রেস্তরা *আলিবাবা*-য় ঢুকে বিশেষ খাবারের অর্ডার দিলাম। দেখলাম খানিকটা কিমা কিংবা চারামাছ তোলা হলো ছাকনিতে। ছাকনিটা ডুবিয়ে দিল ফুটন্ত গরম জলে। মাত্র দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড। তোলা হলো প্লেটে। প্লেটের চারপাশে সাজিয়ে দেয়া হলো অল্পসিদ্ধ বাধাকপি, লেটিস পাতা, নুন, সস ইত্যাদি। এগুলো খদ্দেরকেই মিশিয়ে নিতে হবে।

নুডলস এবং ভাত পাওয়া যায়। থাই রান্নায় মশলার প্রাচুর্য। মাত্র একশ বাথ বা একশ পঞ্চাশ টাকায় দিল একটি বড় গলদা চিংড়ি। কিলো খানেক ফ্রায়েড রাইস, দুখানি কাকড়ার কষা ঝোল। একটা চাদা মাছ ভাজা। হাঙ্গরের কাবাব এবং বড় ঝিনুকের সালাদ। রান্নায় তেল ও মশলা প্রচুর।

খেলাম মামা-ভাগ্নে পেট ভরে। কিন্তু হায়, চা নেই!

পাতায়ার সমুদ্রে এসে দেখি ঘন নীল জল। অন্যদিকে তীর ঘেষে সবুজ নারিকেল এবং পাম ট্র-র সারি। উষ্ণতা উপভোগ করতে আসা নারী-পুরুষরা অর্ধউলঙ্গ ভেজা গায়ে ভেজা বালির ওপর টাওয়েল পেতে সূর্যস্নান করছে। কেউ আয়েশ করে বই পড়ছে। ভেজা বালি দিয়ে কেউ বালির প্রাসাদ বানাচ্ছে।

বেলা পড়ে আসছে। কোথায়ও চায়ের দেখা নেই। অনেক খুজে এক ডাব বিক্রেতার কাছে ফ্লাস্কে রাখা চা পেলাম। দাম শুনে মাথায় হাত। এক কাপ একশ বাথ। হবেই বা না কেন? আমেরিকান বা ইওরোপিয়ানদের কাছে মাত্র দুই ডলার। নস্যি।

ভাগ্নের উক্তি, কেন যে এসব ছাইপাশ নেশা করেন। চলুন হোটেলে গিয়ে ব্যবস্থা হবে।

অগত্যা।

শেষ বিকেলের মিষ্টি রোদের চিকন আলোয় ফেরার পথে দেখছি, আকাশ ছোয়া বিশাল অট্টালিকা। চারদিকের হাইওয়েতে দৃষ্টি নন্দন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাস ও ট্যাকসি। বিধাতাও অকাতরে দান করেছে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রাত নয়টায় ফিরলাম এশিয়ার বিখ্যাত বামরুনগ্রাদ হাসপাতালের কাছে রয়াল গার্ডেন হোম হোটেলে।

ভাগ্নেকে হোটেলে রেখে বের হলাম চায়ের খোজে। সব হোটেল ও রেস্তোরাগুলো তখন জেগে উঠেছে কোলাহলে। বিদেশিরা মেতেছে উষ্ণতায়। কিন্তু হায়! চারদিকে মদের দোকান, চায়ের দোকান নেই।

দিনের বেলায় যদিও বা ব্যবস্থা হয়, রাতে পাওয়া যায় না। খাবারের দোকান, রেস্তরায় গিয়ে অনেক কাকুতি–মিনতি করেছি Sawaf-dii (Hallo), Khaw thoht (Excuse me), Kawrunaa (Please)। ওরা চাকে বলে Ib Lub Khob, কেউ বলে Hopv Kaaz Zaah. সবই বলেছি। আর (Tea) তো বলছিই। ওরা ইংরেজি বোঝে কম। আবার ইঙ্গিতে বুঝিয়েছি। সবার একই উত্তর, নো টি, নো টি (No Tea, No Tea)!

রাত প্রায় সাড়ে দশটা। ওরা রাস্তাকে বলে সই (Soi). সুকুমভিট সই ধরে চলে গেছি চা খুজতে নানানুয়া রোডের শেষ প্রান্তে Nana স্টেশনের কাছে।

ভাগ্নে দুবার মোবাইল করেছে হোটেলে ফেরার জন্যে।

চায়ের নেশায় মাথার যন্ত্রণায় পাগল প্রায়। ঝিম মেরে আছে মাথা। অস্বস্তি ও ক্লান্তিতে দিকশূন্য ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ধরা পড়েছি ব্ল্যাক পুলিশের হাতে।

সার্চ করেছে পকেটের সমস্ত কাগজপত্র খুটে খুটে। অর্ধ থাই, অর্ধ ইংলিশ আর হাত পা নেড়ে আপ্রাণ চেষ্টায় স্বল্প শিক্ষিত পুলিশকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, ভাই বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে ভর্তি। গত রাতে আমরা এসেছি। পাসপোর্ট হোটেলে। আমরা অবৈধ ইমিগ্রান্ট নই।

ছেড়ে দিল এক সময়। হোটেলে ফিরলাম। ততোক্ষণে চায়ের নেশা কিছুটা কেটে গেছে। বাকি নেশাটুকুও কেটে গেল যখন সব পকেট হাতড়েও পেলাম না একশ ডলারের নোটটি।

হায়রে চা! সমুদ্র পাড়ের না খাওয়া একশ বাথের বিনিময়ে গচ্চা দিতে হলো পুরো একশ ডলারের নোটটি।

ভাগ্নে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নিয়ে গেল হোটেলের বলরুমে। থাইল্যান্ডের রাত বিশ্বের সেরা আকর্ষণ। শিক্ষিত শরীর কতো অসাধারণ কাণ্ড করতে পারে, তা না দেখলে অবিশ্বাস থেকে যেতো।

অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়, শোভনও হবে না। বর্ণনা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে। শরীরের শৈল্পিক ব্যবহার অজানাই রয়ে যাবে যদি থাইল্যান্ডের রাতের প্রমোদ কেন্দ্রে বেড়াতে না যান।

তবে হ্যা, নেশাখোর হলে রেডি টি নিতে ভুলবেন না।

খুলনা থেকে

ইয়েনেলমিজ

ইউনিভার্সিটি জীবনের ছাত্রী থাকাকালে টিএসসি–র মাঠের পাশে মামার দোকানের চা সব চায়ের মধ্যে ছিল অনন্য। এই চায়ের স্বাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসফল কিন্তু মিষ্টি প্রেমের কাহিনী।

তার নাম ছিল ইয়েনেলমিজ। জাতিতে টার্কিশ। এক সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে আমার দেখা সবুজ চোখ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওর হঠাৎ পরিচয় থেকে আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব। আমরা একটা কফি শপে বসতাম। কিন্তু পান করতাম চা। সেখানে চা দিতো বেশ বড় একটা মগে ভরে।

ইয়েনেলমিজ চা খেতে খুব পছন্দ করতো, সে সঙ্গে আমিও। দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুই তিন কাপ চা খেয়ে পেট প্রায় ব্যথা করে ফেলতাম। তবু যেন কথা শেষ হতো না। চায়ের সঙ্গে চলতো রোমান্স।

কিন্তু বেশি দিন চললো না। একদিন আচমকা ঝড়ে ভেঙে গেল সুন্দর সময়গুলো। কোনো এক দানব যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমাদের আনন্দঘন দিনগুলো। তার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ হলো। সেই সঙ্গে বন্ধ হলো সেই কফি শপের চা রোমান্স।

ওর একটা কথা এখনো মনে পড়ে যখনই চা খেতে যাই। মাঝে মধ্যে চা খারাপ হলে সে বলতো, অজুর পানির মতো চা। খুব মজা পেতাম আমি।
জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটার অর্থ কি?
সে বলেছিল এটা তাদের দেশের কথা। চা বা কফি খেতে খারাপ হলে এটা তারা রসিকতা করে বলে। অজু করার পর হাত মুখ ধোয়া যে পানি থাকে সেটা যদি সংরক্ষণ করে খাওয়া হয় তবে তা হবে খুব বিস্বাদ। তাই এই মজার বাক্যটা ব্যবহার করা হয় খারাপ চা, কফির উদাহরণ হিসেবে।
এখনো মনে পড়ে সেই কথা। মনে পড়ে শেষ দেখা হওয়ার কথা। সে আমাকে অনুরোধ করেছিল তাকে বিয়ে করে তার দেশে চলে যাবার জন্য। অসংখ্যবার ছিল সেই অনুরোধ। বড় আকুল ছিল তার মিনতি।
না, শুনিনি তার কথা। শোনার উপায় ছিল না। ঘর সংসারে নিজেকে বাধার মানসিকতা তখন শেষ। স্বপ্ন আর রঙ নিয়ে আসে না কল্পনায়।
ইয়েনেলমিজ হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল অনেক আনন্দ রঙিন সময়গুলো। মাঝে মধ্যে কফি শপটার সামনে গিয়ে দাড়াই। দূর থেকে দেখি, ভেতরে যেতে ইচ্ছা করে না। কষ্ট হয়, অনেক কষ্ট।
এখনো চা খেতে খারাপ হলে মনে পড়ে তার রসিকতা আর ভেসে ওঠে তার সবুজ চোখের মুগ্ধতা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জাপান থেকে

পর্তুগিজ

- লিজি পাশা

কয়েকদিন হলো নতুন বাসায় এসেছি। ঢাকা শহরের এক প্রান্তে অনেকটা নিরিবিলি এলাকা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ফেরিওয়ালার হাক-ডাক নেই, নেই যখন তখন বিকট শব্দে গাড়ির হর্ন বাজানো। মন ভালো হয়ে যাবার মতো চারদিকে নিঃশব্দ ছিমছাম ভাব।
নিজের মধ্যে একটা উৎসাহ ভাব জাগিয়ে নতুন বাসা নতুন জিনিসপত্র দিয়ে সাজাতে চেষ্টা করছি। সুটকেস খুলে এক এক করে শাড়িগুলো বের করি। আলমারিতে তুলে রাখতে গিয়ে নিজের অজান্তে শাড়ির ভাজ খুলে গন্ধ নিই।
কিন্তু একি! শাড়ির ভাজে ভাজে লুকানো পুরনো দুঃখগুলো ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে অবশ করে দেয় আমাকে। দুঃখ মাখা শাড়ি বুকে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। সব উৎসাহ হারিয়ে যায়। সুটকেস খোলা পড়ে থাকে। নিজেকে টেনে নিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাড়াই।
মাথার উপর নীল আকাশ। শাদা মেঘ। মৃদু বাতাস। একটা প্রজাপতি উড়ে গিয়ে লেকের পাড়ে নারিকেল গাছে খেলা করে। অসীম শূন্যতা নিয়ে লেকের ঝিরিঝিরি কল্লোল দেখতে থাকি। ধীরে ধীরে ছোট্ট লেকটা ক্রমাগত বড় হতে হতে বিশাল ভিক্টোরিয়া ফলস হয়ে যায়। আচ্ছন্নের মতো শুনতে থাকি জলপ্রপাতের একটানা মধুর শব্দ। ফলস-এর পানি উড়ে এসে ভিজিয়ে দেয় আমাকে। সিক্ত হই, আপ্লুত হই।
আমার দুই চোখ চেয়ে জলের ধারা নামে। তখন ঝাপসা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই, দুটি ধবধবে ফর্শা হাত এক কাপ চা নিয়ে পরম মমতায় বলছে আমাকে, সোনামণি, এটা খেয়ে নাও। এই বিশেষ পর্তুগিজ চা খেলে তোমার নার্ভ শক্ত হবে, আবেগ প্রশমিত হবে, কান্না বন্ধ হবে, মন শান্ত হবে এবং তুমি অনেক ভালো বোধ করবে।

আমার দুই পায়ের ওপর অসহায়ভাবে মুখ রেখে শুয়ে আছে লারার কুকুর সাকা। আট বছরের ছোট্ট লারা দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে করুণ সুরে কি যেন বলার চেষ্টা করছে। লারার আন্টি বিয়াত্রিচ ছল ছল চোখে অবিরাম আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে। লারার ভো ভো (নানি) ফিলুমিনা–র হাতে চায়ের কাপ।

আফ্কার একটি দেশে আমার পর্তুগিজ প্রতিবেশী ওরা।

এই স্মৃতি, এই দৃশ্য চিরদিনের জন্য আমার মনে ফিক্সড হয়ে গেছে।

ফিলুমিনার দুধ বিহীন সেই বিশেষ সুগন্ধী চায়ের কাপে কখনো চুমুক দিয়েছি, কখনো দিইনি। জানি না সেই চা আমার কোনো উপকার করেছিল কি না। কিন্তু সেই চায়ের উত্তাপের সঙ্গে ওই পর্তুগিজ পরিবারের ভালোবাসার উষ্ণতা মিলেমিশে এক হয়ে ওই মুহূর্তে বাচিয়ে রেখেছিল আমাকে।

দেশে ফেরার আগে লারার মা আমার প্রিয় বান্ধবী টেরেসার কাছে অতীত স্মৃতি বিজড়িত সারা জীবনের সব সংগ্রহ জমা রেখে এসেছি। সঙ্গে যদি ক্ষতবিক্ষত মনটাও রেখে আসতে পারতাম!

প্রায় দশ বছর পর দশ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আকুলভাবে ছুটে এলাম আপনজনদের স্পর্শ নেবো বলে। জানা ছিল না বহুদূর পরবাসে আমার ভাগ্য বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে আপন স্বজনরাও অচেনা হয়ে গেছে। দেশ ছাড়ার সময় যে চোখে দেখে গিয়েছিলাম আমার জন্য অপার ভালোবাসা, স্নেহ–মমতা, ফিরে এসে দেখলাম সব ধুয়ে–মুছে গেছে। সেখানে এখন কেবলই নিষ্ঠুরতা। কথার তীর ছুড়ে আঘাত করার প্রতিযোগিতা।

না। এসব নিয়ে ভাবতে চাই না আর। বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এসে চেষ্টা করি কিছু গোছগাছ করতে। কিন্তু আরো এলোমেলো হয়ে যায় সব। উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াই শোবার ঘরে। বসার ঘরে। আলতো করে স্পর্শ করি নতুন প্লাস্টিক পেইন্ট করা দেয়াল। নরমভাবে হাত রাখি জানালার নতুন পর্দায়। ছুয়ে দেখি টাইলস বসানো নতুন মসৃণ মেঝে।

হঠাৎ নতুন করে অনুভব করি পুরনো কষ্টের উপস্থিতি যা আফ্কায় আমার বাগানের মালবেরি ও মেক্সিকান আপেল গাছের শুকনো পাতার নিচে চাপা দিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ নাছোড়বান্দা দুর্বিষহ কষ্ট ছাড়বে কেন আমাকে! এ যে আমার চিরসহচর, অন্তহীন একাকীত্বের একমাত্র সঙ্গী!

জ্যোতির্ময় দুই হাতে অলৌকিক চায়ের কাপ নিয়ে নিঃশব্দে যেন ফিলুমিনা খুব কাছে এসে দাড়ায়। ফ্যানের বাতাসের সঙ্গে ফিশফিশ করে বলে, লক্ষ্মী মেয়ে, আর কাদে না। খেয়ে নাও এই বিশেষ পর্তুগিজ চা।

ঢাকা থেকে

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

– কেয়া

ছোটবেলায় একজনকে আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু বলতে পারিনি। সে আমার শিক্ষক ছিল। তখন আমার বয়স আর কতোই বা হবে! বারো কি তেরো। সেদিন ছোট হৃদয় দিয়ে ভালো লাগা, ভালোবাসাটা উপলব্ধি করেছিলাম যার প্রভাব আজও অনুভব করছি। এতোই ভালো লাগতো যে, তার চাকরি নিয়ে চলে যাওয়াটা আমাকে অনেক কাদিয়েছে।

এভাবেই দিন পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর, বছর পেরিয়ে যুগ, অবশেষে একদিন সে বিদেশ থেকে ফিরলো। জীবনের প্রথম ভালোবাসা। তাই আজও তাকে ভুলতে পারিনি। এদিকে আমার সংসার নিয়ে আমি খুব সুখী।

বিদেশ থেকে আসার পর সে প্রায়ই আমার বাসায় আসতো আমাকে, আমার সন্তানকে দেখতে।

হঠাৎ একদিন সে আমাকে বললো, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু বলতে পারিনি আর আজও ভুলতে পারিনি।

১৯৭১–এর যুদ্ধ দেখার ভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু মনের মাঝে যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা অনুভব করলাম। পেয়ে হারানোর ব্যথা বলতে যা বোঝায়। এক সময় তার মায়াবী মুখটার কাছে হেরে গেলাম। তাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করলাম নিজের চাওয়া পাওয়ার কথা। এমনিভাবে সে প্রায়ই আসতো আমার বাসায়।

কেন যেন মনে হলো আমার স্বামী তার এ অবাধ আসাটা পছন্দ করছে না। যদিও এটা আমার ভুল ধারণা ছিল। তাই তাকে বিরতি দিতে বললাম। তারপর বেশ কিছুদিন বিরতি।

এদিকে তাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করলো। তার দোকানে ফোন করলাম। জানলাম সে সিলেট চা বাগানে কর্মরত তার ভাইয়ের ছেলের কাছে গেছে।

অতঃপর একদিন রাতে আমার বাসায় তার আগমন। আমার হাতে একটা কিছু এগিয়ে দিয়ে বললো, কিভাবে যে আসি ভাবছি। একটা অজুহাত তো চাই। তাই তোমাকে দেয়ার এবং দেখার জন্য সিলেট থেকে চা নিয়ে এসেছি।

সেদিন আমার সন্তান কাছেই ছিল, আর স্বামী একটু পর এলো। প্রচণ্ড ভালো লাগায় মনটা ভরে গেল। চা আমার কখনোই ফেভারিট ছিল না। কিন্তু কেন যেন সেদিন থেকে চায়ের মাঝে তার গন্ধ পাই। মনে মনে ভাবলাম, একদিন যাকে দেখার জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতাম, অথচ আজ কি না চা তাকে নিয়ে এলো আমার কাছে।

মনে পড়ে প্রচণ্ড প্রসব বেদনার সময় তাকে দেখতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমি হয়তো আর বাচবো না। কেন যেন মনে হয় চা না হলে এতো ভালো লাগার মুহূর্ত হয়তো আসতো না।

সেদিনের সেই আমার ডানে থাকা অতীত (ভালোবাসা), আমার বামে থাকা বর্তমান (স্বামী) আর আমার কাছে থাকা ভবিষ্যৎ (সন্তান) – এই তিনের সমন্বয়ে ভালো লাগার মুহূর্তটা আজও চায়ের মাঝে অনুভব করি।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

টা

– সাহাব উদ্দিন আহম্মেদ

ভাইয়া, আমাদের বাসায় যাবেন। গরিবের বাসায় গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এলে খুশি হবো।

এক জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এক ভাবী আমাকে কথাটি বলেছিলেন। ওনার গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুর। আমার সঙ্গে ইটালিতে পরিচয়। বাসায় কোনোদিন যাওয়া হয়নি।

ভাবী সুন্দর ভঙ্গিমায় সালাম দিয়ে হাসি হাসি মুখে কুশল বিনিময় করলেন। ভাবীর কথাবার্তা সত্যিই বেশ সুন্দর।

ভাবীকে বললাম, ভাবী, আগামী সপ্তাহে আপনাদের বাসায় গিয়ে চা পান করে আপনাকে খুশি করবো।

মনে মনে সত্যিই স্থির করলাম ভাবীর বাসায় যাবো। ভাবীর আমন্ত্রণে যথেষ্ট আবেদন ছিল, আকুতি ছিল। সুন্দরী তরুণী বা রমণীদের আবেদন ফেলতে পারি না। এটা আমার এক ধরনের ভালো অভ্যাস।

পরের সপ্তাহে ছুটির দিনে সত্যি সত্যিই ভাবীর বাসায় উপস্থিত হলাম। ভাবী আমাকে দেখে কিছুটা অবাক হলো। বললাম, ভাবী, আপনার হাতের চা খেতে চলে এলাম।

শুধু চাই খাবেন। অন্য কিছু না।

অন্য কিছু না হয় অন্যদিন।

ভাবী এক কাপ চা বানিয়ে এনে আমার হাতে দিলেন। চায়ে চুমুক দেয়ার পর ভাবী জিজ্ঞাসা করলেন, চা কেমন হয়েছে।

বললাম, যে এতো সুন্দরী তার চা কি ভালো না হয়ে পারে! আমার জীবনের সেরা চায়ের মধ্যে এটা একটা।

কি বললেন, আমি সুন্দরী? আপনার ভাই বলে আমার নাকি ঠোট মোটা।

আরে না ভাবী। আপনার ঠোট, নাক, গালসহ সব কিছুই বেশ সুন্দর। ভাই হয়তো আপনাকে ক্ষেপানোর জন্য বলেন। ভাইয়া আসলেই আপনাকে বেশি ভালোবাসেন।

সেদিন এ রকম নানান গল্প করে, রঙ-রসের আলাপ করে ভাবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি।

বিদায়ের সময় ভাবী আমাকে মাঝে মধ্যে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। ভাবীর বক্তব্য, সবার সঙ্গে কথা বলতে গল্প করতে ভালো লাগে না আনন্দ পাওয়া যায় না। আমার সঙ্গে গল্প করে বেশ মজা পান তিনি।

এরপর চা খাওয়ার অজুহাতে মাঝে মধ্যেই ভাবীর বাসায় যাই।

ভাবীও এক সপ্তাহ না গেলে ফোন করেন যাওয়ার জন্য।

এছাড়াও রাতে সেফ টাইমে ভাবীও ফোন করেন, আমিও। ভাবীর জীবনের অনেক ঘটনাই আমাকে বলেন।

দিন দিন ভাবী যেন আমার প্রতি দুর্বল হতে থাকলেন। প্রতিদিনই ভাবীর সঙ্গে ফোন করতে হয়। আমিও ভাবতে থাকি, ভাবী কি তাহলে আমার প্রেমে পড়ে গেলেন? কিন্তু কিভাবে সম্ভব?

এছাড়া চিন্তা করি, ইটালিতে এ রকম ঘটনা বেশ আছে। ইটালি থেকে দেশে গিয়ে ইটালির সার্টিফিকেট দিয়ে মূর্খ ছেলেরাও শিক্ষিত সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করে। পরে তারা এখানে এসে শিক্ষিত ছেলেদের সঙ্গে বের হয়ে যায় বা পরকীয়ায় আবদ্ধ হয়।

তাহলে ভাবী কি আমার সঙ্গে পরকীয়া করতে চান?

ভাবী কি চায় আমাকে দেখতে হবে।

হঠাৎ একদিন ভাবী ফোন করে বললেন, ভাই, আজ আমাদের বাসায় আসুন। তবে আজ চায়ের সঙ্গে টাও খেতে হবে।

বললাম, ভাবী টা-টা কি?

ভাবী বললেন, সেটা এলেই দেখবেন।

টাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় আছি। ভাবী আমাকে কি খাওয়াবেন? কি হতে পারে! চিন্তার শেষ নেই।

ভাবীর বাসায় গিয়ে দেখি বেশ আয়োজন।

ভাবী, এতো আয়োজন কেন?

সব সময় এসে শুধু চা খেয়েই চলে যান। তাই আজ একটু ভালো-মন্দ রান্না করছি। এই জন্য আপনাকে ফোন করেছি।

খাওয়া শেষে ভাবী বললেন, আমার ভাই দেশে বিয়ে করেছেন। তার ক্যাসেট এসেছে, চলুন দেখি।

ঠিক আছে, দেখান।

আমার ভাইয়ের পাশে বসা ওই মেয়েটিকে দেখেন তো কেমন লাগে?

বুঝতে পারছি, মেয়েটি ভাবীর বোন হবে। মেয়েটি প্রশংসার করতে লাগলাম। ভাবী, মেয়েটি তো অনেক সুন্দর। উচু, ফর্শা, সবদিকে মেয়েটি ফিট। আমি তো মনে করেছি, আপনিই বুঝি এলাকার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। দেখি আপনার থেকে সুন্দরী মেয়ে আছে। কে ওই মেয়েটি?

আপনার পছন্দ হয়েছে?

বলেন কি ভাবী! অনুষ্ঠানের সেরা সুন্দরী এই মেয়েটিকে আমার পছন্দ হবে না? যার এতোটুকু পছন্দ বোধ আছে তারই পছন্দ হবে।

ভাবী বললেন, ভাই, আপনাকে একটা কথা বলি। ওই মেয়েটি আমার বোন। আমি আর আপনার ভাই চিন্তা করেছি যদি আপনার পছন্দ হয় এবং আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আমার বোনটিকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

ভাবীর কথা শুনে হাসছিলাম আবার দুঃখও পাচ্ছিলাম। এই বুঝি আমার চা খাওয়া শেষ।

ভাবীকে বললাম, সবার সঙ্গে, প্রিয়জনদের সঙ্গে বুঝ করে জানাবো। আর ভাবী যাওয়ার আগে ভালো করে আরেক কাপ চা বানিয়ে দেন।

এক সপ্তাহ পরে ভাবী ফোন করলেন, কি ভাই, খবর কি? ফোনও করেন না, এলেনও না। আর কি বুঝ করলেন?

দেখুন ভাবী, অনুমতি পাইনি।

কার অনুমতি?

আমার বৌয়ের। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা ঠিক না।

আপনি বিয়ে করেছেন?

হ্যা ভাবী, একটা করেছি।

বিয়ে করেছেন কোনোদিন তো বললেন না!

কোনোদিন তো জিজ্ঞাসাও করেননি।

এরপর থেকে ভাবীর বাসায় যাওয়া হয় না, ভাবীর হাতের চাও পান করা হয় না। দেখলে শুধু কুশল বিনিময় হয়।

রোম, ইটালি থেকে

জি- সেভেন

- ফেরদৌস জাহান

জি–সেভেন (G-7) নাম ছিল আমাদের গ্রুপের। ক্যাম্পাস এবং হলে মোটামুটি সবাই চিনতো। আর এই নাম মানেই দল বেধে বেড়াতে যাওয়া, ক্লাসে যাওয়া এবং বিকেলে দল বেধে ঘোরা। সবাই কম বেশি ভয় পেতো। ভালোবাসতো আবার সমীহ করতো।

আমরা বেড়াতে ও খেতে খুব পছন্দ করতাম। আমাদের রুমে চলতো সকাল–বিকেল রাশিয়ান টি পর্ব। লাল চায়ের অপর নাম *রাশিয়ান* টি।

একদিন বিকেলবেলা বের হলাম চা খেতে। রীতিমতো অর্ডার দেয়া হলো চা–মামাকে। আর বিপত্তিটা ঘটলো সেইখানে। চা–মামা জানতো আমরা সবাই চায়ে চিনি কম খাই এবং সেভাবেই চা দেন আমাদের। কিন্তু সেদিন ভুল করে অন্যজনের অর্ডার দেয়া চা পড়লো আমাদের ভাগ্যে।

বলে নেয়া ভালো, আমাদের মধ্যে রীতা সবচেয়ে চিনি কম খায় চায়ে। আর পড়বি তো পর রীতার হাতে পড়লো। চা খেয়েই সে হতবাক! কারণ চায়ে চিনি বেশি। কিন্তু রীতা তো চাখোর। সে চা ফেলে দেয়ার বান্দা নয়। তাই সে চায়ের মধ্যে পানি ঢেলে নিল।

সেই দৃশ্য দেখে আশপাশে বসা ভাইয়া–আপুরা হেসে খুন।

তারপর থেকে তাকে আমরা *পানি চা* বলে ডাকতাম।

আজ আমরা সবাই দূরে। সবার চাকরি হয়েছে, সংসার হয়েছে, ভালো আছি সবাই। তাই আজও চা করতে গেলে মনে পড়ে সেই বিকেলের কথা।

কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট থেকে

কারবালার ময়দানে

- আখন্দ বাবু

এক. প্রবাস জীবন শুরু করার পর থেকে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এ রকম এক বন্ধু রুবেল। কোনো রেস্তোরায় বসে আড্ডা দিচ্ছি আর যে যার মতো চা, কফির অর্ডার দিচ্ছে। রুবেলের চরিত্র অত্যন্ত মজার। কি করছে, কি বলছে কোনো জড়তা নেই।

অর্ডারের পর সবাই চায়ের অপেক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপরত। কিন্তু দেখা গেল টেবিলে আগে থেকে রাখা চিনির পাত্র থেকে অনবরত হাতের তালুতে চিনি উঠিয়ে জিভ দিয়ে চেখে চলেছে। সঙ্গে আঙুলের অগ্রভাগে থুথু লাগিয়ে টেবিলে ছড়িয়ে পড়া চিনির টুকরো মুক্তাদানা মনে করে আপন মনে জিভের অগ্রভাগে লাগাচ্ছে বিরামহীন।

সবাই চা পর্ব শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠবে। দেখা গেল রুবেল এক চুমুকও দেয়নি চায়ের কাপে। সে অনবরত নিরলসভাবে চিনি কুড়িয়ে চলেছে।

কেউ হয়তো বললো, কিরে, চা খাবি না, আমরা তো যাবো।

অমনি ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে পানির মতো ঢক ঢক করে শেষ করে ফেললো। ও চা খায় সবার দেখাদেখি।

দুই. জগাবাবুর পাঠশালায় অধ্যয়নরত অবস্থায় আনিস নামের এক বন্ধুর একটি পরিকল্পনা আমাকে অবাক করেছিল। সে ধরে নিয়েছে যে, তার সঙ্গে কোনো মেয়ের সম্পর্ক হবে না। আদর করে কোনোদিন কোনো প্রেমিকাকে চুমু দেয়া তার কপালে নেই। তাই সে পরিকল্পনা মাফিক কলেজের ক্যান্টিনের প্রতিটি চায়ের কাপে তার ঠোট লাগানো চাই। তাই সে প্রতিদিন ছয় সাত কাপ চা পান করতো। একদিন সে সবগুলো চায়ের কাপে ঠোট লাগাবে এবং তার ঠোট লাগানো কাপে মেয়েরা ঠোট লাগিয়ে চুমুক দিয়ে চা পান করবে তাতেই তার শান্তি। কি উদ্ভট পরিকল্পনা!

তিন. ভিয়েনাতে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে একটি মাসিক বাংলা সংবাদপত্র বের হচ্ছে। নাম *ইউরো সংবাদ।* যেহেতু নতুন একটি বাংলা সংবাদপত্র, তাই উৎসাহ ছিল অনেক। একদিন সম্পাদক সাহেবের কাছ থেকে টেলিফোন এলো সহযোগিতা করার জন্য। যদিও আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই পত্রিকা বের করার তবুও কাছের তিন চারজন বন্ধুসহ আমিও জড়িয়ে পড়লাম।

প্রথম সংখ্যা বিধায় লেখা বাছাই, যাচাই করতে মাস দুয়েক আমরা প্রতি শুক্র ও রবিবার এক সঙ্গে মিলিত হতাম। খেয়াল করলাম দুই ঘণ্টার মতো প্রতিবারই সময় লাগছে। কিন্তু কোনো চা পান করা তো দূরে থাক, এক গ্লাস পানিও পান করা হচ্ছে না পরিবেশের কারণে। কারণ এটি বাংলাদেশিদের মসজিদের একটি রুম।

আমি আর বারিবাবু অনেকবার এই নিয়ে আলাপ করেছি যে, এই ধরনের কাজের মাঝে যদি এক কাপ চা না খাওয়া যায় তবে মনটা চাঙ্গা করা যায় না। সম্পাদক সাহেবকে প্রতিবারই বলেছি, ভাই, এখানে না বসে অন্য কোথাও বসি।

সম্পাদক সাহেব বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে তাকে সরাসরি চায়ের ব্যবস্থা করতে বলতে পারিনি পাছে তিনি আবার কিছু মনে করেন! তিনিও কোনো প্রকার ব্যবস্থা কখনো রাখেননি উদাসীনতার কারণে। তিনি খেয়াল করেননি যে, চা থাকলে আলাপচারিতা জমে ভালো।

পত্রিকাটি এখনো বের হচ্ছে প্রতি মাসে। তবে সময়ের অভাবে আমার আর সম্পৃক্ত থাকা হয়নি। এই ধরনের একদিনের মিটিং থেকে বের হয়ে আমি আর বারিবাবু হাসতে হাসতে প্ল্যান করলাম, যে একটি লেখা লিখবো, নাম হবে *কারবালার ময়দানে লেখকদের মিটিং* এবং তাদের পড়ে শোনানো হবে।

কারবালার ময়দানে মিটিং নাম শুনে বারিবাবুর হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাওয়ার অবস্থা।

বাবু বললেন, কারবালা ময়দানে পানির বদলে চা কেন?
উত্তরে বললাম, লেখকদের কারবালা ময়দানে পানির বদলে চা দিলে বেশি খুশি হবে।

চার. সবশেষে একটি অনুরোধ করে লেখা শেষ করতে চাই। সব পাঠকের কাছে একটি অনুরোধ, একজন ভিখারি যখন দরজায় নক করে বলবে, মাগো ভিক্ষা দেন, সেই ভিখারিকে যদি বলা হয় তোমাকে এক কাপ চা দিই তবে দেখবেন তার মলিন চেহারায় আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তখন সে আর তাকে ভিখারি মনে করবে না, অতিথি ভাববে।

এই সুযোগটি নষ্ট করবেন না। কারণ অনেকে মন্তব্য করেছেন আজ থেকে পনেরো বছর পরে বাংলাদেশে কোনো ভিক্ষুক থাকবে না। তাই সুযোগটি হাত ছাড়া করবেন না।

ভিয়েনা থেকে

তিন পদ

- ফৌজিয়া আক্তার

শেষ বিকেলে চা খেতে কার না মনে চায় – তবে চা–টা অবশ্যই তৃপ্তিদায়ক হতে হবে। ভালো করে এক কাপ চা বানান। নিজে খান, অপরকে খাওয়ান। নিচে তিন পদ চা তৈরির রেসিপি দেয়া হলো।

দুধ চা

এক কাপ চা তৈরি করতে কাপের একটু বেশি পানি ভালো করে ফুটতে থাকলে দুধ দিতে হবে। দুধ অবশ্যই গরম থাকতে হবে। ফোটানো দুধ মিশ্রিত পানিতে চা চামচের আধা চামচ চাপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নামিয়ে ছাকনিতে ছেকে পরিবেশন করবেন। তবে দুধ যদি গুড়া হয় তাহলে চাপাতা একটু বেশি লাগবে। চা ছেকে গুড়া দুধ পরিমাণ মতো দিয়ে ভালো করে চামচ দিয়ে নাড়বেন। চায়ে যার যার রুচি মতো চিনি দিয়ে পরিবেশন করুন।

আদা চা

পানি ভালো করে ফুটলে আদার কুচি পাতিলে দিয়ে বলক দিতে হবে। তেজপাতা অথবা দারচিনির টুকরাও দেয়া যায়। ফোটানো পানিতে চাপাতা দিলেই হয়ে গেল আদা চা। লক্ষ্য রাখতে হবে, পাতিলে যখন আদা দেয়া হবে, ভালো করে পানি যেন ফোটে। পানির রঙ লাল হওয়া চাই। ঠাণ্ডা সর্দিতে এ চা খুব উপকারী।

লেবু চা

পাতিলে পানি ফুটলে চাপাতা দিতে হবে। চা ছেকে নামিয়ে একটু লেবুর রস দিয়ে চিনি দিয়ে নাড়লেই লেবু চা।

খেয়াল রাখতে হবে, লেবুর চায়ে এক কাপে এক চিমটি বেশি চাপাতা দিলে চা তিতা হয়ে যায়। লেবুর রস দিতে হবে এক ফোটা মতো।

চা–টা আর একটু ভালো করতে হলে পানিতে চা দেয়ার আগে একটু চিনি দিয়ে পানি ফুটতে দিলে লেবু চা–টা অপূর্ব লাগবে খেতে।

নিরালা, খুলনা থেকে

এগারো বছর

- সাহানা

আমি ঠাণ্ডা চা খাওয়ার মানুষ। দেখা গেল সবার চা খাওয়া শেষ, আর আমার শুরু।

ছোটকাল থেকে দেখছি আমাদের বাসায় অতিথি না এলে চা বানানো হতো না। বাসায় চা বানানোর ঝামেলার ভয়ে আব্বা দোকানে গিয়ে চা খেতেন।

আমাদের বাসায় চা খাওয়ার শুরু হয় বড় ভাইয়ের বিয়ের পর। ভাবীর আব্বা চা বাগানে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে ভাবী চাপাতা নিয়ে আসতেন আর মজা করে চা বানিয়ে আব্বাকে দিতেন, সেই সঙ্গে আমাদেরকে।

অবশ্য পরীক্ষার সময় রাতে আমাদের চা খাওয়ানো হতো যেন ঘুম না আসে। পরে অবশ্য বড় হতে হতে চা খাওয়া ধরেছি। তবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে।

চা নিয়ে কিছু ঘটনা আছে যেগুলো ছোট হলেও জীবনে এতো বেশি দাগ কেটেছে যে, ভুলে থাকার মতো নয়। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ঘটনায় এগুলো খুব বেশি মনে পড়ে।

এক.

আমার আব্বা মারা যান প্রায় বিশ বছর আগে। বৈশাখ মাসে। প্রচণ্ড গরম এক বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটায়। আমরা দুই বোন আর মা ছাড়া বাকি পাচ ভাইবোন তখন ঢাকায়। আব্বা মারা গেছেন গ্রামের বাড়িতে। সেখানেই ওনাকে দাফন করা হবে।

ঢাকায় খবর পাঠানো হয় দুপুরেই।

তখন ঘরে ঘরে এতো ফোন ছিল না, এখনকার মতো হাতে হাতে মোবাইল বা এতো বেশি ফোনের দোকানও ছিল না। ফলে সবার বাসায় গিয়ে তাদেরকে নিয়ে সবাই এক সঙ্গে রওনা দিতেই বিকেল হয়ে গেল।

বিকেলে যখন সবাই লঞ্চে উঠলো তখন এক লঞ্চের কর্মচারীদের সঙ্গে অন্য লঞ্চের কর্মচারীদের মারামারি লেগে গেল। তখন ওনারা অন্য আরেকটা লঞ্চে ওঠালেন।

কথায় বলে, বিপদের রাস্তা ফুরায় না। যেখানে ঢাকা থেকে চাদপুর যেতে সময় লাগে চার পাচ ঘণ্টা সেখানে তাদের চাদপুর পৌছাতেই রাত বারোটা বেজে গেল। সেখান থেকে এতো রাতে গ্রামের বাড়িতে যেতে কোনো রিকশাচালক রাজি হলো না। তখন রাস্তাঘাটও এতো উন্নত ছিল না। অন্যদিকে এখনকার মতো এতো সহজে মাইক্রোবাস পাওয়া যেতো না।

তাই ওনারা সেদিন রাতে বাড়ি যেতে পারলেন না। চাদপুরের বাসায় রয়ে গেলেন।

ওদিকে আমরা দুই বোন আর মা আব্বার লাশ নিয়ে সারা রাত বসে আছি তাদের অপেক্ষায়। পাশে বসে কেউ কেউ কোরআন শরিফ পড়ছিল। এতো গরমে লাশের শরীরে পচন ধরবে। তাই কোথা থেকে যেন চাপাতা আর বরফ এনে আব্বার সারা শরীর ঢেকে দেয়া হলো।

পাশে বসে আমরা দেখছি। যে মানুষ সকালেও জীবিত ছিল সেই মানুষের গায়ে এখন বরফ, চাপাতা, এ যে কি কষ্টের, কি যন্ত্রণার বলে বোঝানো যাবে না। সেই দৃশ্য কখনো ভুলতে পারবো না।

দুই.

তখন মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি। আমার একটা বান্ধবী ছিল, নাম মুন্নী। ওর ছোট বোন তখন চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, থাকে মেয়েদের হলে। দুই বান্ধবী মিলে ঠিক করলাম চিটাগাং ইউনিভার্সিটি যাবো। উদ্দেশ্য আমার ডিগ্রির মূল সার্টিফিকেট তোলা, সেই সঙ্গে এই ইউনিভার্সিটির অপরূপ সৌন্দর্য দেখবো। এক সঙ্গে দুই কাজ, *রথ দেখা, কলা বেচা।*

দুই বান্ধবী ভোর পাচটার ট্রেন মেঘনায় রওনা দিলাম চাদপুর থেকে। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে-ফিরে বেড়িয়ে রাতে ছোট বোনের হলে থাকলাম। পরদিন ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে আবার দুজন রওনা দিলাম বিকাল পাচটার ট্রেনে। আমাদের ট্রেন লাকসাম এসে অনেকক্ষণ থেমে থাকলো। আমরা দুজন খুব মজা করছি, জানালা দিয়ে ফেরিওয়ালাদের থেকে এটা সেটা কিনে খাচ্ছি, মনে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গ।

হঠাৎ মুন্নী বললো, চল চা খাই, আমার ফেরিওয়ালাদের চা খেতে ইচ্ছা করছে।

বললাম, এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে।

ও বললো, এখন ছাড়বে না। দেখিস ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে আমাদের চা খাওয়া হয়ে যাবে।

আমি যেহেতু ঠাণ্ডা চা খাওয়ার মানুষ, তাই মোটেই খেতে চাচ্ছি না। কিন্তু ও নাছোড়বান্দা, খাবেই।

আমরা চাওয়ালার কাছ থেকে চা নিয়ে টাকা পরিশোধ করে যেই চা খাওয়া শুরু করলাম ঠিক তখনই ট্রেন চলতে শুরু করলো।

চাওয়ালা কাপ চাইতে লাগলো।

আমি কোনো রকমে মুখ পুড়িয়ে সবটুকু চা খেয়ে কাপ দিয়ে দিলাম আর মুন্নী একটু চাও খেতে পারলো না। চাসহ কাপ দিয়ে দিল।

তারপর ওর সে কি আফসোস! শখের চা খেতে পারলো না।

আমি ঠাণ্ডা চা খাওয়ার মানুষ ঠিকই খেয়ে ফেললাম।

সে বললো, তুই কিভাবে খেয়েছিস? তারপর মুন্নী বললো, সত্যি, তুই সব পারিস, সব পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারিস, আমি পারি না। সারা রাস্তা ওর আফসোসের শেষ নেই।

এখন জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতে ওর কথাটা খুব মনে পড়ে। হয়তো সত্যিই সব পারি। তা না হলে এতো দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা কিভাবে সহ্য করছি। এতো লাঞ্ছনা–গঞ্জনা, অপমান, অবহেলার পরও বেচে আছি কেন?

তিন.

আমার বিয়ের ঘটনা। আমার আকদের দেড় মাস পর অনুষ্ঠান করে আমাকে শ্বশুরবাড়িতে নেয়া হলো। আকদের পরদিন আমার স্বামী এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। দুজন বসে কথা বলছি। মাঝখানে ভাবী এসে বিভিন্ন নাশতার সঙ্গে চা দিয়ে গেলেন।

চা খেয়ে যখন সে কাপটা রাখতে গেল তখন সেটা কাত হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই কাপের হাতলটা ভেঙে গেল।

আমার বুকটা ধক উঠলো।

সেও অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

বললাম, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছি আর চিন্তা করছি, উপর থেকে পড়লো না, ধাক্কা খেয়ে ভাঙলো না, অথচ কাপটা রাখতে গিয়ে ভেঙেই গেল? নতুন সেটটা কানা হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারিনি, প্রথম দিন কাপ ভাঙাটা ছিল বিয়ে ভাঙার আলামত। যে বিয়ে ভাঙতে এগারো বছর লাগলো, আর বুঝতেও এগারো বছর।

ঢাকা থেকে

লেসন

- রানা জামান

২০০০ সালে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ের একজন সর্বোচ্চ কর্মকর্তা সরকারি কাজের তদারকিতে নীলফামারীতে আসেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের ডাকেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে বক্তৃতা শুরু করেন।

ওনার মতো উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে থেকে শিখতে পেরেছি যে, এক সঙ্গে চাকরি করলেও অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে নেই বা জানতে নেই।

বক্তৃতার শুরুতে তিনি বলেন যে, তিনি কিছুটা অসুস্থ। তাই বাংলায় কথা বলতে পারবেন না।

তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেন। অসুস্থ অবস্থায় মাতৃভাষায় কথা বলা না গেলেও ইংরেজিতে অতি সহজেই কথা বলা যায় এটা সেদিন প্রথম জেনেছি।

এক পর্যায়ে চা নাশতা সরবরাহ করা হয়। তিনি চা-টা একটু শূন্য গ্লাসে ঢেলে তাতে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে গ্লাস পূর্ণ করে এক চুমুকে পুরোটা পান করে নিলেন। ওনার এই লেসনটা রফত করতে পারিনি আজও।

চাদপুর থেকে

তেলাপোকা

- মোহাম্মদ মুইনুল ইসলাম

চা খাওয়া শিখেছি বাবার কাছ থেকে। সেটা কতো বছর বয়সে খেয়াল নেই। তবে বুঝজ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি মায়ের পানের বাটার পাশে একটা টিপট থাকতো সব সময়। এরপর ফ্লাস্কের চল শুরু হলে টিপট-এর স্থান দখল করে নেয় ফ্লাস্ক। বাবা-মা দুজনই প্রচুর চা ও পান খান। সেই অভ্যাস আমাদের ভাইবোনদের মধ্যেও আছে। তবে বিশেষ করে আমার মধ্যে একটু বেশি।

আমার বড় বোনের শ্বাসের টান বা এজমা আছে। ছাত্রী জীবনে ছিল না। সংসার জীবনে দেখা দিয়েছে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আর্য়ুবেদ, হুজুর-মুর্শিদ এ জাতীয় প্রায় সকল চিকিৎসা বাবা শেষ করেছেন আপার রোগ ভালোর জন্য। কিছুটা ফল পেলেও পুরোপুরি ফল কোথাও পাওয়া যায় না।

একদিন বাবা আমাদের পাশের গ্রামের *ছইয়াল বাড়ির কবিরাজ*-এর কাছে গেলেন আপার চিকিৎসার জন্য। রোগ বৃত্তান্ত বললেন।

কবিরাজ সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শুনে কোনো ওষুধপত্র দিলেন না। বললেন, আপনার মেয়েকে যদি গোটা দুই তেলাপোকা খাওয়াতে পারেন তাহলে তার এজমা রোগ ভালো হয়ে যাবে।

বাবা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তা কি করে সম্ভব! ভাবছেন, যে মেয়ে ঠিক মতো মাছই খেতে চায় না তাকে তেলাপোকা খাওয়াবো কি করে।

বাসায় এসে বাবা কাউকে কিছু না বলে চিন্তা করতে লাগলেন। আমাদের বাসার নিয়মে সকাল আটটা, এগারোটা, বিকাল চারটা ও সন্ধ্যা সাতটা এই চার টাইম চা খাওয়া হয়।

সকাল এগারোটার পর্বে বাবা বড় আপাকে ডেকে বললেন, মনিরা, তুই আমার সঙ্গে বসে নাশতা খাবি। শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলে অনেক দিন দেখা হবে না।

আপা শান্ত মেয়ের মতো বাবার পাশে বসে নাশতা খেলেন।

আমরা সবাই খেলাম।

বাবার ডায়াবেটিস বিধায় তিনি নিজে চিনি ছাড়া চা বানিয়ে খান। তিনি নিজের জন্য এক কাপ চা বানালেন, সঙ্গে আপার জন্যও এক মগ লাল চা বানালেন। বড় এক মগ চা আপাকে দিলেন।

সবার খাওয়া শেষ। কিন্তু বড় মগ হওয়াতে আপা তখনো চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। চায়ের শেষ চুমুকে আপা চায়ের কাপ হতে আনমনে কিছু একটা নিয়ে চুষছে। হয়তো তেজপাতা। কেননা লাল চায়ে আদা, দারচিনি, তেজপাতা, লেবু ইত্যাদি থাকে। হঠাৎই আমরা লক্ষ্য করলাম এটা তেজপাতা নয়, তেলাপোকা।

আপা এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে শুরু করলেন বমি। বমির পর বমি। সিরামিকের মগটি হাতের ধাক্কা লেগে মেঝেতে পড়ে চৌচির হয়ে। আপার শ্বাস টান বেড়ে গেল।

আপাকে দ্রুত খাটে হেলান দিয়ে বসিয়ে মুখে ইনহেলার দিলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর আপা স্বাভাবিক হলেন।

চায়ের মধ্যে কি করে তেলাপোকা এলো সে প্রশ্ন সবার মনে থাকলেও কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছে না। কেননা চা বানিয়েছেন স্বয়ং বাবা।

এবার বাবাই ধীরে ধীরে বললেন সকল ঘটনা।

প্রথমে ছইয়াল বাড়ির কবিরাজ-এর নির্দেশ মতো তিনি গোপনে ঢাউস সাইজের দুটি তেলাপোকা সংগ্রহ করেন। অতঃপর তেলাপোকা দুটিকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার পানিতে সিদ্ধ করেন। সেই সিদ্ধ পানি দিয়ে তিনি স্পেশাল লাল চা তৈরি করেন। অ্যাকশন গাঢ় করার জন্য একটি সেদ্ধ তেলাপোকা চায়ের মগে দিয়ে দেন। তারপর চা তিনি আপাকে পরিবেশন করেন।

আপাও বাবার হাতের চা খুব মজা করে খেয়েছেন। চায়ের তলানি হিসেবে তেজপাতা মনে করে তেলাপোকাটি চুষে খেয়েছেন।

বাবার এই চা তৈরির ফর্মুলা শুনে আমরা তো থ। তেলাপোকার চা খাওয়াতে আপার এজমা কমেনি। তবে অন্য ওষুধ খাওয়াতে এখন অনেকটা ভালো। কিন্তু আপার এই তেলাপোকার চা খাওয়ার স্মৃতি আমরা এখনো ভুলতে পারিনি।

আপাকে বলতেই তিনি ওয়াক করে জিভ বের করে ফেলেন। আর আমরা সবাই হাসি।

এরপর থেকে আজ পর্যন্ত মা আর কোনোদিন বাবাকে চা বানাতে দেননি। বাজারে রেডি টি বের হওয়ার পর অনেক দিন আমরা রেডি টি খেয়েছি। কিন্তু দুধ চায়ের মজাই আলাদা। তাই এখন দুধ চা খাই।

রূপসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর থেকে

টক- মিষ্টি

– অনাদিতা

এক.

জীবনে প্রথম যে জিনিসটি বানাতে শিখেছি তা হলো চা। চা বানানোর আনন্দে নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। তখন অবশ্য মাত্র ক্লাস ফোরে পড়ি।

বাসায় নতুন কেউ এলে যে করেই হোক তাকে আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতাম, আমিও কিছু একটা পারি।

পরীক্ষার পরে নানুর বাড়ি বেড়াতে গেলাম। বিকেলে চা খাওয়ার আগে ঘোষণা করলাম, আমি চা বানাবো। সবাই খুশি, বিশেষ করে বুয়া।

অনেকক্ষণ চেষ্টা-চরিত্র করার পর যে জিনিসটি তৈরি হলো তাকে কিছুতেই চা বলা যায় না। হতে পারে ময়লা কাপ ধোয়া পানি! কিন্তু লজ্জা পাবো ভেবে বুয়াকে কিছুক্ষণ বকাবকি করে নানুকে কোত্থেকে আজেবাজে সব চাপাতা কেনে, আমাদের বাসার জিনিস ভালো বলে চলে এলাম।

আর এখন! সত্যিকার অর্থেই খুব ভালো চা বানাতে পারি। আম্মু যখন সবার সামনে বলেন, আমাদের অনু খুব ভালো চা বানাতে পারে তখন বাইরে ভাব দেখালেও মনে মনে প্রচণ্ড আনন্দ লাগে।

দুই.

আরেকদিনের ঘটনা। আমাদের প্রচুর চাপাতা লাগে। দুলাভাই সিলেটে থাকতেন বলে বড় প্যাকেটে করে চাপাতা পাঠাতেন। তখন প্রচুর চা খেতাম। একদিন রান্নাঘরে গিয়ে দেখি চাপাতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। বুয়াকে টাকা দিয়ে দোকানে পাঠালাম।

আমাদের বুদ্ধিমতি বুয়া চা পাতার সবচেয়ে ছোট প্যাকেট নিয়ে এলো।

বিকেলবেলা দেখি চাপাতার কৌটা ভর্তি। অবাক হয়ে গেলাম। কারণ এতো ছিল না! পরে দেখি, আমাদের বুয়া চাপাতার কৌটা ভেবে ভুলে কালোজিরার কৌটায় সব চাপাতা ঢেলে ফেলেছে। তখন তো বুয়াকে দেখে আমাদের হাসি আর থামেই না।

তিন.

কলেজে ওঠার আগে প্রায়ই রাতে একটা স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমি আমাদের বাসার সামনে অনেক বড় একটা দোকানে গিয়েছি। চায়ের দোকান! দোকানের চারদিকে গ্লাস ফিট করা। এসিও আছে। চায়ের দাম প্রতি কাপ মাত্র দুই টাকা।

প্রচুর লোকজন আসছে আর আমি নিজ হাতে দোকানের চা বানাচ্ছি। কিসব স্বপ্ন যে দেখতাম! আসলে আমাদের স্কুলের সামনের একটা চায়ের দোকানে আমরা প্রায়ই চা খেতাম। কিন্তু পরিবেশ যথেষ্ট নোংরা এবং সবগুলো কাপের কানি ভাঙা। হয়তো এ কারণে দুঃখে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম।

চার.

প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর সকালের চা-টা আমিই বানাই।

একদিন আম্মু চা বানাতে বলে বাইরে হাটতে গেলেন।

ঘুমের চোটে চোখ মেলতেই পারছিলাম না। কারণ রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করেছি। আম্মু তো আর সেটা জানেন না!

কাজের মেয়েকে চায়ের পানি দিতে বলে আরেক দফা ঘুমাতে গেলাম। হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি সাড়ে সাতটা বাজে। দৌড়ে রান্নাঘরে গেলাম। দেখি কাজের মেয়েটা বড় এক মগ পানি নিয়ে চুলার পাশে দাড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে বললো, *আফা, পানি তো হুগায় যাইতাছে। তাই আরো পানি ঢালতাছি।*

ময়মনসিংহ থেকে

হারিয়ে যাওয়া বন্ধু

– শিল্পী

কথা প্রসঙ্গে আমার দেবর বললো, যায়যায়দিনের আগামী সংখ্যার বিষয় *চা*। তুমি ইচ্ছা করলে কিছু লিখে পাঠাতে পারো। এর কিছুদিন পরেই লিখতে বসা।

১৯৯৬ সালের দিকের ঘটনা। তখন আমি সদ্য এসএসসি দিয়েছি। পরীক্ষার পর অবসর মনটা তখন স্বাধীন। একটা বড় হয়েছি বড় হয়েছি অবস্থা। ছুটি কি করে কাটানো যায় এটা নিয়ে ভাবছি। হঠাৎ মনে হলো কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে কেমন হয়। বড় হয়েছি, একটা দুইটা ছেলে বন্ধু থাকলে ভালো হয়।

এরপর অনেক চিন্তা-ভাবনা জল্পনা-কল্পনা। কিশোরী মনের যতো আজগুবি চিন্তা আর কি! হঠাৎ মনে হলো পত্রমিতালি করলে কেমন হয়? ঠিকানা কিভাবে জোগাড় করবো? আমরা বাড়ি থেকে খুব একটা বের হই না। আমরা তখন থাকতাম আদমজী নগর। আমার বাবা আদমজীর একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

যাহোক, অনেক কষ্ট করে একটা পত্রমিতালির বই জোগাড় করলাম। সেখানে ঠিকানা দেয়া ছিল অনেকের। সেখান থেকে একটা ছেলের ঠিকানা পছন্দ হলো। নাম সৈকত। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তার বাড়ি ছিল আমিনবাজার। সে লিখেছে ভালো মনের বন্ধু চাই।

কি করি, এখন চিঠি লিখতে হবে। আমার হাতের লেখা আবার খুব খারাপ। তাই লিখতে লজ্জা হলো। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম মামাকে দিয়ে লেখাবো।

মামার সঙ্গে খুব ফৃ ছিলাম। মামাকে সব বললাম।

মামা শুনে বললেন, লিখে দিতে পারি। তবে প্রতি চিঠির বদলে এক কাপ চা করে খাওয়াতে হবে।

এখানে বলে রাখা দরকার, আমি চা ভালো বানাতে পারতাম বলে আমার একটা সুনাম ছিল।

কি আর করা। মামাকে চা খাইয়ে সুন্দর একটা চিঠি লিখিয়ে নিলাম।

মামা ছিলেন একটু সাহিত্যমনা। তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে আমার জন্য চিঠিটি লিখে দিলেন। চিঠি পোস্ট করলাম। তারপর আশায় আছি কবে উত্তর আসবে।

তারপর হঠাৎ উত্তর এলো। খুব সুন্দর চিঠি, সুন্দর হাতের লেখা, আমি তো প্রথম কারো কাছে থেকে চিঠি পেয়ে রোমাঞ্চিত।

যাহোক, সে তার বিস্তারিত লিখেছে। কি সুন্দর করে লিখেছে, পড়ে ভালো লাগলো।

লিখেছে বন্ধু হতে চায়।

এরপর আমি আবার মামাকে চা খাওয়ানোর বিনিময়ে উত্তর লিখে নিয়ে পাঠালাম।

এভাবেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হলো।

নতুন দেশ জয়ের মতো নতুন মানুষ সম্পর্কে জানলাম। আমার কথাও মামার মাধ্যমে জানালাম এক সময়। এমন হলো, তার চিঠি পেলে ভালো লাগতো, চিঠি লিখতে দেরি করলে খুব খারাপ লাগতো।

হঠাৎ একদিন আমার মামার চাকরি ট্রান্সফার হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। আমি তো সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারি না। কি করবো?

অনেক চিন্তা করে একটা চিঠি লিখলাম। লিখলাম এতো দিন যা কিছু লিখেছি মামার মাধ্যমে এগুলো আমার কল্পনাপ্রসূত না। তবে যা করেছি ভুল করেছি। ক্ষমা চাইলাম।

সেই যে পাঠালাম, উত্তর আর এলো না। অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু অপেক্ষা আর শেষ হয় না। দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর পেরিয়ে গেল।

এখন আমি রীতিমতো গৃহবধূ, আমার স্বামী ব্যবসা করে। বগুড়াতে থাকি। এখনো আমার মনে হয় সেই স্মৃতি। হায়, কেন মামাকে চা খাইয়ে চিঠি লিখিয়ে নিলাম।

এখন তার উদ্দেশ্যে শুধু লিখতে চাই। সৈকত, আপনি ছিলেন আমার কিশোরীবেলার বন্ধু যে বন্ধুত্বের স্মৃতি সব সময় আমার মনে থাকবে। পারলে ক্ষমা করবেন। যেখানেই থাকুন, যেভাবেই থাকুন, ভালো থাকবেন।

আপনার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু।

বগুড়া থেকে

আমাকে খেও না

– পুতুল

চা হলো ঘুম তাড়ানোর ওষুধ। কিন্তু আমাদের বাসার অনেকে চা খেয়ে ঘুমোতে যায়। আমার মা-বাবা সেহেরি খেয়ে আগে চা খান, কখন আজান পড়ে।

চা কখনো খাইনি বললে ভুল হবে। কিন্তু কখনো প্রিয় নয়।

হয়তো বা ছোটবেলার ওই কথাটা, আমার মা বলতেন, চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়। আল্লাহর দেয়া গায়ের রঙটা কালো করতে চাইনি বলেই চা কখনোই প্রিয় হয়নি। তবে এসএসসি ও এইচসি পরীক্ষার আগে চা খেয়ে অংক কষেছি এবং বুককিপিং করেছি। ঘুম তাড়াতে চা খেয়েছি পরীক্ষার সময়। মাঝে মধ্যে কোনো জরুরি প্রয়োজনের সময় ঝিমুনি এলে একটু লেবু চা খাই। তবে গরমকালে চা খেলে ভীষণ গরম লাগে এবং ঘুম চলে যায় চোখ থেকে।

আমার ভাইয়ের চা না খেলে সকালে বাথরুম হয় না।

আমার পাচ বছরের মেয়ে চা খেতে চায়। কিন্তু আমি এই বিষয় অপছন্দ করি।

আমার খালাতোভাই ফাহিম ছোটবেলায় ফিডারে করে দুধ চা খেতো। দুধ চায়ের বদলে ওভালটিন ও মালটোভা দিলে ছুড়ে ফেলে দিতো। তখন তার বয়স এক বছর ছয় মাস ছিল। এখনো চায়ের প্রতি তার প্রবল আসক্তি। তবে আমাদের বাসায় অনেক বাচ্চারা আসে, তারা টি ব্যাগ নষ্ট করে খুবই আনন্দ পায়।

চা নিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল আমাদের বাড়িতে। আমার ভাইজি রূপা, তখন তার বয়স তিন চার হবে, আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। আমাদের কাজের মেয়েটা চা বানিয়ে ছেকে বসার ঘরের দিকে আসছিল। হঠাৎ করে রূপা দৌড়ে এসে মেয়েটির গায়ের ওপর পড়লো। আর তখনি ফুটন্ত গরম চা রূপার খালি গায়ে! ওই স্মৃতি মনে পড়লে এখনো ভয় পাই। আমার মেয়েকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিই না। সেই বছর অনেক ভোগান্তি হয়েছিল রূপার।

চা বাগান আমার কল্পনা, কারণ বাংলাদেশের মেয়ে হয়েও সিলেট চা বাগান দেখিনি। আমার চা বাগানের বাংলোর ভেতরে থাকার খুব শখ। জানি না এই শখ কখনো পূরণ হবে কি না। ইনডিয়ার উটিতে যাবার পথে চা বাগানের পাশ দিয়ে গেছি। কিন্তু চা বাগানের পথে কখনো হাটা হয়নি। একজন আমাকে কথা দিয়েছে সিলেটে জাফলং চা বাগানে নিয়ে যাবে। দেখি সে তার কথা রাখে কি না।

চা নিয়ে দুঃখময় দুটো ঘটনা বলি।

আমার মা–বাবা প্রচণ্ড পরিমাণে দুধ চা খেতেন। ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর সুকরল দিয়ে টি ব্যাগ খেতেন। বর্তমানে শুধু গরম পানি–টি ব্যাগ, তবুও চা ছাড়তে পারেননি।

আমার সহোদর ভাইটি এতো গরম চা খেতো যে, ওর দাতে সমস্যা দেখা দিল। এখনো চা খায়। তবে একটু গরম কমলে। ও খুব সুন্দর চা বানাতে পারে।

জাপানিজদের চা খাওয়া একটা শৈল্পিক ব্যাপার যা দেখতে খুবই ভালো লাগে।

সবশেষে বলি, চা তুমি বেচে থাকো যুগ যুগ। কিন্তু আমাকে খেও না বা আমি যেন চায়ের নেশায় না পড়ি। কমপিউটারের কিবোর্ডে যে ব্যক্তি এই লেখাটি টাইপ করেছেন তিনিও চা খেতে খেতে এই কাজটি করেছেন।

খুলনা থেকে

আটরশিতে

– মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জুলহাস

আমার জীবনের প্রথম চা পান করার কথা এখানে বলছি।

১৯৯২ সালে আমার ছোট কাকার সঙ্গে লঞ্চে আটরশি, ফরিদপুর যাই বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ওরস উপলক্ষে। আমার ছোট কাকা আমাকে তার আদরের সবটুকু অংশ বিলিয়ে দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন। কোনোদিন ভুলতে পারবো না তার কথা। অনেক নতুন নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, নতুন কিছু খাওয়া ছিল তার শখ।

বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম হাজার হাজার মানুষের ঢল। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, বড় বড় আলোকসজ্জা দিয়ে সাজানো গেট। খাবার মাঠ, হাসপাতাল, স্থায়ী–অস্থায়ী বহু দোকানপাট, ওরস উপলক্ষে ফরিদপুরবাসীর জন্য এক বিরাট মেলা বসে। নিজ চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না কতো বাহারি আয়োজনে মেলা বসে।

আমরা বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে গিয়ে মাদ্রাসার বারান্দায় তিন চার দিন থাকার জন্য অস্থায়ী শামিয়ানা পাতি, বিছানাপত্র রাখি এবং একজন লোককে সর্বক্ষণ পাহারা দিতে হয় এসব কিছু। আমার ছোট কাকা আমাকে এক এক করে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। বিশাল এলাকা, তিন চার দিনে ঘুরে শেষ করা যাবে না। ওরসের বয়ান শোনা এবং নামাজ আদায় করতে হয় ঘোরার ফাকে ফাকে।

দ্বিতীয় দিনে ঘুরতে গিয়ে কাকা বললেন, চল চা খাই।

আমার জীবনে এটা ছিল প্রথম চা খাওয়া। এর আগে জানতাম না, চায়ের স্বাদ, গন্ধ, তিতা, মিঠা, ঠাণ্ডা, গরম। আমি মনে মনে ভাবতাম চা একটি মিষ্টি জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়।

চা খাওয়ার জন্য আমরা বসলাম। অস্থায়ী টিনের ছাপড়া ঘরে নড়বড়ে করে তৈরি করা, অস্থায়ী চেয়ার হলো লম্বা কাঠের তক্তা। লম্বা টেবিলে কোনো রকমে বসে একটু চা খাওয়া। আমাদের সঙ্গে আরো আট দশজন লোক চা খাওয়ার জন্য বসেছিল।

চা দোকানের মালিক সবাইকে এক এক করে চা দিতে লাগলেন।

সবাই চা পান করতে লাগলো।

কাকার সঙ্গে আমিও চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খাওয়ার জন্য রেডি হই। প্রথম চা খাওয়া। তাই ভাবলাম কেউ আমাকে দেখে ফেলে যদি কিছু ভাবেন। তাই সুযোগ বুঝে কাপ হাতে নিয়ে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ কাপ মুখে ঢেলে দিই।

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনা। চা এতো গরম ছিল যে, গরম সইতে না পেরে পাশের বসা লোকদের গায়ে ফেলে দিই। গরম চা তিনজনের গায়ে পড়ায় তারা চা খাওয়া ফেলে ছুটে বাইরে আসতে লাগলো।

এক লোক ছাপড়া ঘরের খুটি ধরে বের হতে গেলে হাতের টানে সম্পূর্ণ চায়ের দোকান পড়ে যায়। শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি, যেন কি ঘটেছে এখানে।

আমি আর কাকা বসে থাকি টিনের নিচে। আমাদেরকে বের করা হয় টিন সরিয়ে।

চায়ের দোকানদার ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমি ছোট থাকায় কিছু বলেননি।

অনেক লোক চায়ের দাম না দিয়ে চলে যায়। দোকানদারের সাময়িক কিছু ক্ষতি হয়। কাকা লোকটিকে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে লোকটি ক্ষতিপূরণ নেয়নি। দোকানদার বললেন বাবা, এখন থেকে চা চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে খেও। একবারে ঢেলে নয়।

এখন চাকরির সুবাদে দৈনিক তিন চার কাপ চা খাওয়া হয়। চায়ের কাপ হাতে এলে মনে পড়ে যায় সেই প্রথম চা খাওয়ার কথা। যতোদিন বেচে থাকবো ততোদিন ভুলতে পারবো না প্রথম চা খাওয়ার কথা। এবং চায়ের দোকানের মালিকের কথা। আল্লাহতাআলা লোকটিকে বহুদিন হায়াত দান করুক।

কালিগঞ্জ, গাজীপুর থেকে

জুলেখা

- হাসান মাহমুদ আরিফ

সীতাকুণ্ডু রেলস্টেশনের পাশের খালি জায়গায় প্রতিদিনকার শেষ বিকেলের আড্ডায় আমি, চাচাতো ভাই সুমন, বন্ধু অপু আর রাজন যতোক্ষণ মেতে থাকতাম, চা বিক্রেতা জুলেখা ততোক্ষণ আমাদের পাশে বসে থাকতো।

শ্যামবর্ণ, আশ্চর্য রকম সুন্দর দুটি চোখের অধিকারী, হালকা-পাতলা গঠনের জুলেখা মন দিয়ে শুনতো আমাদের কথা। অন্য কোনো কাস্টমার চায়ের জন্য ডাকলে ইশারায় বুঝিয়ে দিতো, দেখছেন না ভাইয়াদের সঙ্গে বসে আছি। ভাইয়ারা যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ চা বেচা বন্ধ।

প্রথম কয়েকদিন চুপচাপ বসে থাকলেও ধীরে ধীরে জুলেখা আমাদের আড্ডার একজন হয়ে উঠলো, কথার মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতো। কিছু না বুঝেও বিজ্ঞের মতো ওর মতামত দিতো। আমরা হাসলে হাসতো। ওর খিলখিল হাসির শব্দ শুনে যদি বলতাম, হাসছিস কেন?

সহজ-সরল উত্তর, আপনাদের কথা শুনলে হাসি চেপে রাখতে পারি না।

বিশেষ কোনো কারণে আমাদের চারজনের কেউ আড্ডায় উপস্থিত না থাকলে বার বার জানতে চাইতো, যে বন্ধুটি আসেনি সে কেন আসেনি? অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

একবার সুমন ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লে বিকেলের আড্ডার সময়টুকু সুমনের রুমে কাটাতাম।

আমাদের দুই দিন স্টেশনে যেতে না দেখে তৃতীয় দিন চায়ের ফ্লাস্ক হাতে জুলেখা হাজির। সুমনের হাত ধরে সে কি কান্না। সুমন যতোদিন অসুস্থ ছিল ততোদিন বিকেলের চা বেচা ফেলে আমাদের পাশে বসে থাকতো। চাচিআম্মা প্রথম দিন বিশ টাকা দিতে চাইলে ওর সুন্দর চোখ দুটোকে এতো বেশি কষ্টে মাখিয়ে দিয়েছিল যে, চাচিআম্মা জুলেখাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

ভালোই চলছিল আমাদের কলেজ জীবন। কিন্তু হঠাৎ একদিন এলো ভয়ংকর সে রাত।

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস। শনিবার, রাত তিনটা। খালাতো বোনের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষে আমি, সুমন, অপু আর রাজন আমাদের বাসায় ফিরছিলাম।

স্টেশনের পাশের পরিত্যক্ত ছোট রুমটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে ভেসে এলো হালকা গোঙানির শব্দ। রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেয়া গোঙানির শব্দ অনুসরণ করে পরিত্যক্ত রুমের সামনে দাড়ালাম।

সুমন দরজায় লাথি মারতেই দরজা খুলে গেল। স্টেশনের লাইটের আলো-আধারে রুমটাকে আলোকিত করে দিতেই দেখতে পেলাম, মানুষরূপী দুজন জানোয়ার আর বিধ্বস্ত জুলেখাকে।

কিশোরী জুলেখার বুকে জেগে ওঠা নরম মাংসপিণ্ড নরপশুদের ভয়াল থাবায় রক্তাক্ত। বস্ত্রহীন জুলেখা ওর লম্বা চুলগুলো গলার দুপাশ দিয়ে এনে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড ঢেকে দিল, কচি দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেও রক্তঝরা লজ্জা স্থান ঢাকতে ভুলে গেল।

না পাঠক বন্ধুরা, সেদিন আমরা চার যুবক মানুষরূপী জানোয়ারদের গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক, প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারিনি কেন তারা এমন করলো?

কারণ তারা ছিল একটি ছাত্র সংগঠনের ছাত্রনেতা। সেই ছাত্র সংগঠনের সোনার ছেলেরা আমাদের সামনে দিয়ে বীরদর্পে হেটে গেল। চোখ আছে। তাই চেয়ে ছিলাম।

আমাদের যে মুখ দিয়ে প্রতিবাদের ভাষা বের হওয়ার কথা ছিল সে মুখ দিয়ে আমরা উল্টো জুলেখার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সকাল না হতেই কেন স্টেশনে এসেছো?

অথচ আমরা ভালো করেই জানতাম, ভোর রাতে স্টেশনে যে ট্রেনটি থামে সে ট্রেনে পুরো এক ফ্লাস্ক চা বেচতে পারে।

আজ দূর প্রবাসে বসেও চা, চায়ের ফ্লাস্ক, কাপ দেখলে বমি আসে।

সউদি আরব থেকে

দেশে দেশে

- মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন

· বাঙালিরা চা খায়, পান করে না।

· কয়েক বছর আগে ঈশ্বরদী রেলওয়ে স্টেশনে দেখছিলাম বৃটিশ যুগের সেই বিজ্ঞাপন - *চা পান স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী*।

· আমার নানা বৃটিশ ইনডিয়ায় ১৯১১ সালে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। তিনি বৃটিশদের সঙ্গে ইনডিয়ার মধ্যপ্রদেশে রেলওয়েতে চাকরি করতেন। চা খেতেন পিরিচে ঢেলে। প্রশ্নের উত্তরে বলতেন, এতে ঠোট পোড়ার ভয় থাকে না।

· আমেরিকা ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ফোর বা ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে দেখেছি সকালের ব্রেকফাস্টের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের চায়ের আয়োজন। যার যেটা পছন্দ সেভাবে বানিয়ে নিতে পারে। দুধ চিনিসহ চা। দুধ

চিনি ছাড়া কিন্তু লেবুর স্লাইস সহ। কোনো কিছু ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধিসহ চা। ইত্যাদি। এসব চা-ই থাকে টি ব্যাগে।

· চায়নায় দেখেছি প্রায় সবখানেই সব সময় গরম চা পাওয়া যায়। ওরা খাবার পানিটাও হালকা গরম সরবরাহ করে।

· মালয়শিয়াতে দেখলাম ওরা ঠাণ্ডা চা খায়। অনেক চেষ্টা করেও ফুটন্ত পানির গরম চা পাওয়া মুশকিল।

· আমেরিকা ও কন্টিনেন্টাল ইওরোপের মানুষরা কফি বেশি খায়। চা কম খায়। তবে বৃটিশরা চা বেশি খায়। কিন্তু কফির তুলনায় কম গরম চা তারা খায়।

· আমার ছেলেদের মামাবাড়ি সিলেটে দেখেছি সকালের নাশতা শেষে চায়ের সঙ্গে অবশ্যই বিস্কিট বা মুড়ি থাকবে। চা আর পান কখনো আলাদা করা যায় না, সঙ্গে সিগারেট।

· আমার প্রিয়তমা স্ত্রী নাকি বিয়ের আগে ছয় থেকে আট গ্লাস চা খেতো। এখন সকাল ও বিকেলে দুই মগ। আমি অবশ্য চা ছেড়ে কফি ধরেছি বছর পাচেক হলো। তিন ছেলের কেউই চা খায় না।

· নতুন দিল্লিতে চা খেয়ে বেশ মজা পেয়েছি। ইনডিয়ান টি বেশ কড়া এবং সত্যিই মজার।

· ১৯৭৫ সাল। ছাতক পাল্প মিলে চাকরি করি। ছাতক বাজারে ভালো চা পাওয়া যায় না। আমার বিরক্তির উত্তরে সিলেটি কলিগ জানালেন, চা বাগানের সব বাতিল চা অকশনে বা নিলামে বিক্রি হয় এবং সেগুলো সিলেটের স্থানীয় বাজারেই বিক্রি হয়। ভালো চা সব বাইরে বা বিদেশে চলে যায়। জানি না বর্তমানে এর উন্নতি হয়েছে কি না।

· সউদি রেস্টুরেন্টগুলো চালায় সাধারণত ইয়েমেনের লোকজন। চা সরবরাহ হয় একটা ছোট চিনামাটির কেৎলিতে। তাতে বেশি পরিমাণ চিনি দেয়া এবং সঙ্গে কয়েকটা *নানা* থাকে। এই নানা হলো আমাদের দেশে তুলসি পাতার মতো সুগন্ধি পাতা। এ চা অবশ্যই দুধ ছাড়া। এখন ইনডিয়ান টি-এর মতো গ্লাসে দুধ চা পাওয়া যায়। বলতে হবে *হালির সাই*।

· সবশেষে একটা বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করবো।

আব্বা ১৯৩৮ সালে মিটফোর্ড থেকে পাস করা ডাক্তার। আব্বার এক ভক্ত রোগী অনেক সাধনায় আমাদের বাসার সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন। সম্ভবত সেটা ১৯৫৪ সাল। তিনি *মধু হাজি* নামেই পরিচিত। বেশ বয়স্ক, সম্মানিত গৃহস্থ। পায়ে হেটে নয়, বম্বে থেকে জাহাজে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে হজ করেছেন। তার সামাজিক পজিশন উন্নতির লক্ষ্যেই আমাদেরকে এ নিমন্ত্রণ।

এ উপলক্ষে স্থানীয় গণ্যমান্য অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সুন্দর টাপর দেয়া বড় মোষের গাড়িতে আমাদের নেয়া হয়েছে মফস্বলের ওই গ্রামে।

হাজি জানেন, আমাদের বাসায় চায়ের অভ্যাস আছে। তাই চায়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নাশতা শেষে চায়ের পালা। সকলের সামনে কাসার গ্লাস দেয়া হলো, সেগুলো এক দুই লিটারের উপরে সাইজ। বড় কাসার জামবাটি ভর্তি চা আনা হলো এবং বড় কাসার গোল চামচে করে গরম গরম চা প্রতি গ্লাসে তুলে দেয়া হলো। একটু পরে আমরা কেউ-ই আর কাসার ওই গ্লাসগুলো ধরতে পারি না। খুবই গরম হয়ে গেছে।

যাহোক, অনেক কষ্টে আমরা যে যতোটুকু পেয়েছি শেষ করেছি। কিন্তু মুশকিল হলো গৃহকর্তা চামচে করে আরো চা (স্থানীয় ভাষায় *বারগি*) দিতে চাচ্ছেন, কেউ আর নিতে চাচ্ছেন না। তাই গৃহকর্তা মনঃক্ষুণ্ন।

তার সন্দেহ, তার বাসায় তৈরি প্রথম চা হয়তো ভালো হয়নি। তাই কেউ *বারগি* নিচ্ছে না। তার মতো জাদরেল গৃহস্থের বাসায় হোটেলের মতো একটা ছোট কাপে চা খাবে, এক্সট্রা নেবে না, এটা তার জন্য সম্মানের নয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা যে বেহাল সেটা তার খেয়াল নেই।

হাজিচাচার আত্মার শান্তি হোক। চাচার চা ভোলার মতো নয়।

সউদি আরব থেকে
jamal_da@yahoo.com

তিক্ত

– মোহাম্মদ শাহীন আল মাসুদ

একটা সময় ছিল ভাবতাম যে, চা খাওয়াটা নিছক খাওয়াই, বা যাদের খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেছে তারাই শুধু চা খায়। তাই খুব একটা চা খেতাম না।

আমার প্রফেসর মামার তো কড়াকড়ি নিষেধ চা খাওয়ার অভ্যাস যেন না করি। অথচ তিনি সকাল–বিকেল মাথা ধরার অজুহাতে চা খেয়ে থাকেন।

আস্তে আস্তে যখন চায়ের মর্যাদা বুঝতে পারলাম তখন তা হয়ে গেছে নিত্যপানীয়। সকাল–বিকেল না খেলেই নয়। দিনটাই যেন মাটি হয়ে যায়।

ছোটমামা শাহজালাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হওয়ার সুবাদে সেখানে প্রায়ই যাওয়া পড়ে। বাসায় চা খেতে না পারায় বাইরে থেকে খেয়ে আসতাম। ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের কয়েকদিন আগে সিলেটে যেতে হলো।

মানসিক অশান্তির কারণে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। তাই নিশ্চিত ছিলাম রেজাল্ট খারাপ হবে। রেজাল্টের দিন দুপুরের খাবার খেয়ে বাসা থেকে বের হয়ে এদিক–ওদিক ঘুরে ফিরছি বিষণ্ন মনে। সন্ধ্যার পরে কি করবো না করবো ভাবতে ভাবতে জিন্দাবাজারের পঞ্চখানা রেস্টুরেন্টে এক কাপ চা খাওয়ার জন্য গেলাম।

চেয়ারে বসে একটা বয়কে চায়ের অর্ডার দিলাম।

যেখানে চা তৈরি করা হয় সেখানে গিয়ে সে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বয়ও তিনটা চায়ের অর্ডার দিল।

অর্ডার দেয়ার পর যাকে চায়ের অর্ডার দিয়েছি সেই প্রথম বয়টা চা আনতে গেল।

যে তিনটা চায়ের অর্ডার দিল সেই দ্বিতীয় বয়টাও চা আনতে গেল। আমি যাকে চায়ের অর্ডার দিয়েছি সেই প্রথম বয়টা এক কাপ চা হাতে নেয়া মাত্রই দ্বিতীয় বয়টা তাকে ধমক দিয়ে চা রাখতে বললো।

প্রথম বয়টা চা না রেখে নিয়ে আমার জন্য আসতে উদ্যত হলে দ্বিতীয় বয়টা তার হাত থেকে চায়ের কাপ রেখে তার গালে কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

আমি বসে বসে শুধু চেয়ে রইলাম।

মার খাওয়া প্রথম বয়টার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে শুরু করলো।

রেজাল্ট খারাপ করবো এই ভেবে মনটা খারাপ হয়ে আছে। এই ঘটনায় মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল।

মার খাওয়া বয়টাকে অন্য বয়রা সান্ত্বনা দিল। আর মার দেয়া দ্বিতীয় বয়টাকে ধমক দিল এবং বিচার হয়ে গেল।

প্রথম বয়টা কান্নাজড়িত হয়ে আমাকে চা দিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু ঘটনার প্রেক্ষিতে আর চা খাওয়ার ইচ্ছা আমার রইলো না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে চা দিলাম। ভালো চা বানানো হয়েছে ঠিকই তবে আমার কাছে মনে হলো তিক্ত চা।

ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা থেকে

অন্য রকম

- ইকবাল আহসান অয়ন

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করার পর ভালোই চলছিল দিনকাল। বিকেলবেলা ক্রিকেট খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা এবং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির প্রস্তুতি হিসেবে একটু একটু লেখাপড়া করা, এভাবেই যাচ্ছিল সময়। একদিন বন্ধুরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছি একটি দোকানের সামনে। হঠাৎ দেখি এক সুন্দরী মেয়ে হেটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম মেয়েটিকে আমার চাই।

বন্ধুদের আমার পছন্দের কথা জানাতেই শুরু হয়ে গেল গোয়েন্দাগিরি। মাত্র একদিনের মধ্যেই সংগ্রহ হয়ে গেল তার নাম, ঠিকানা, এমনকি পুরো জীবন বৃত্তান্ত। কিন্তু কিভাবে এগোবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

এ রকম একটি উত্তেজনাকর মুহূর্তে বিধাতা যেন তার সকল কৃপা বিলিয়ে দিল এই অভাগার কপালে। এক পড়ন্ত বিকেলে আমার ছোট শহর টাঙ্গাইলের পৌর উদ্যানের একটি বেঞ্চিতে বসে আমি আর চঞ্চল গল্প করছিলাম আর চা খাচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময় আবিষ্কার করলাম আমাদের থেকে খানিক দূরের একটি বেঞ্চিতে বসে আছে সেই অপরূপা সুন্দরী এবং তার এক বান্ধবী।

আমার মাথায় তখন এক দুষ্টুমি চেপে বসলো। আমি চা বিক্রেতাকে বললাম ওই মেয়ে দুটিকে চা দিয়ে আসতে। আচমকা এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ভয়ে আমার শরীর হিম শীতল হয়ে শুধু ঠকঠক করে কাপছিল। চোখ বন্ধ করে মনে মনে শুধু আল্লাহকে ডাকছিলাম।

এই যে মিস্টার, চা কে পাঠিয়েছে?

চোখ খুলে দেখি আমার সামনে মেয়েটি দাড়িয়ে আর চঞ্চল আশপাশে নেই অর্থাৎ ভোদৌড় দিয়ে পালিয়েছে। বুকে সাহস সঞ্চার করে বললাম, আমি পাঠিয়েছি।

কেন পাঠিয়েছেন? মেয়েটির প্রশ্ন।

সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আমার ভালো লাগে। এটা ভালোবাসা পর্যায়ে পড়ে কি না আমার জানা নেই। তবে আপনাকে প্রথমবার দেখার পর থেকে বহুবার চেষ্টা করেছি আপনার সামনে এসে দাড়াতে, আপনাকে কিছু বলতে। কিন্তু এ ভীরু মন বার বার ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিরুপায় হয়ে কোনো কারণ–অকারণ বা বাছ–বিচার ছাড়াই কাজটি করে ফেলেছি। যদি ভুল হয় ক্ষমা করবেন। আমার সহজ সরল জবাব।

দেখুন, ধুম করে যার–তার দেয়া কোনো কিছু খাওয়া বা যার–তার সঙ্গে সম্পর্ক করার মতো পর্যাপ্ত সময় আমার নেই। আশা করি কথাটি মনে রাখবেন। বলেই মেয়েটি হন হন করে খুব দ্রুত চলে গেল।

পরদিন তার কলেজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম এবং আমার কৃত ভুলটির জন্য ক্ষমা চাইলাম।

প্রায় একটা ঘণ্টা বিভিন্নভাবে বোঝানোর পর সে ইতিবাচক সাড়া দিল।

এরপর থেকে ধীরে ধীরে শুরু হলো আমার নতুন করে পথ চলা। ফিরে পেলাম এক নতুন জীবন। কলেজের মাঠে, ফাস্টফুডের দোকানে কিংবা সারা দিনের জন্য রিকশা ভাড়া নিয়ে দুজনে এক বুক রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

একদিন তন্বী আমাকে তার বাসায় যাওয়ার অনুরোধ করলো।

ওর ডাকে সাড়া দিয়ে ওদের বাসায় গিয়ে দেখি, ওদের পরিবারের কেউ নেই, সবাই এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছে। পুরো বাসায় শুধু আমি আর তন্বী।

তন্বী আমার খুব কাছে এসে বসলো এবং প্রথম পরিচয়ের চা কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো, প্রথম পরিচয়ের সময় তোমার পাঠানো সেই ভালোবাসার বার্তাবাহক চা আমার খাওয়া হয়নি। কিন্তু আজ আমি তোমাকে এক বিশেষ ধরনের চা খাওয়াবো যার স্বাদ তুমি কোনোদিন ভুলতে পারবে না। এ কথা বলেই সে আমার ঠোটে ঠোট রেখে ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিল।

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। অন্য রকম চায়ের স্বাদ নিতে আমিও তার ঠোটে, গালে ও বুকে চুমুর ঝড় বইয়ে দিলাম।

আবেগে আপ্লুত হয়ে তন্বী আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

নিজের ভেতর শিহরণ অনুভব করলাম।

দুটি উত্তপ্ত দেহ পরস্পরের মাঝে ডুবে গেল সুখের অণ্বেষায়।

এপর থেকে আমাদের মাঝে মধ্যেই চলতো এই অন্য রকম চায়ের আড্ডা।

তন্বী আজ অন্যের ঘরের ঘরণি। সে তার স্বামীর সঙ্গে মেতে ওঠে চায়ের আড্ডায়। সে তার স্বামীকে রোজ বিশেষ ধরনের চা খাওয়ায়। আমি অতীত স্মৃতি আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মনে মনে বলি, তন্বী, তোমার চায়ের স্বাদ আজো ভুলতে পারিনি, ভোলা যায় না।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

নির্বিকার

- এস.এ.এ

কাজটি করার আগে একটু চা পান করে নিই – এ জাতীয় চা পান একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। এখন কথা হলো কেউ যদি বলে *দাফনের আগে একটু চা পান করে নিই* তবে আপনারা একটু অবাক হবেন বৈকি!

আরো কিঞ্চিৎ অবাক হবেন যদি সেই মৃত ব্যক্তি সেই চা পানকারীর আপন ছোট ভাই হয়। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা না–ই বললাম। তার ভাই দীর্ঘ দিন লিভার সিরোসিসে ভুগে মারা গেছেন। ঢাকার বারডেম থেকে লাশ বরিশালে আনা হয়েছে। দুই ভাইয়ের বাড়িতে কান্নার রোল বয়ে যাচ্ছে। ঠিক হলো বাদ আসরের পরে জানাজা। তারপর লাশ দাফন করা হবে।

তিনি এক ফোটাও কাদলেন না।

কিন্তু আমরা সবাই জানি তিনি ছোট ভাইকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো দুপুরের অভ্যাস মাফিক দিবানিদ্রা সম্পাদন এবং অতঃপর অভ্যাস মাফিক আয়েশ করে চা পান সম্পাদনের মাধ্যমে। তাকে সারা জীবন নিরুত্তাপ থাকতেই দেখেছি। তবে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

তার উপরোক্ত দুই কার্যসম্পাদনের জন্য বৈঠক ঘরে প্রায় দুই ঘণ্টা লোকজন অপেক্ষা করছিল। তিনি প্রস্তুত হলে ভাইয়ের দাফন সম্পাদন হবে।

তিনি আজও বহাল তবিয়তে বেচে আছেন।

সেই দিবানিদ্রা, অতঃপর এক পেয়ালা গরম চা তার আজো প্রাণের সঙ্গী।

saaihjhzwa@yahoo.com

কুসুম

- আসমা খান

সেই ছোটবেলা থেকে চা আমার খুব প্রিয়। চা নিয়ে কতো গল্প যে আছে আমার জীবনে! তার মধ্যে একটি গল্প:

ইডেন কলেজে পড়ার সময়। থাকি জেবুন্নেসা হলের তিনশ চার নাম্বার রুমে। আমার রুমমেটদের মধ্যে কুসুম ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সবচেয়ে বড় মিল ছিল যে ব্যাপারে সেটা হলো চা। ওর যেমন চা হলে আর কিছুর প্রয়োজন পড়তো না, আমারও। তবে সমস্যা হলো চা বানানো নিয়ে। কিচেন ছিল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তিন

তলা থেকে নেমে গিয়ে চা করে আনতে আনতে দুজনেই হাপিয়ে উঠতাম। পরে দুটা ফ্লাস্ক কিনে নিলাম। সকালে একবার করে ভরে রাখলে বিকেল হতে না হতেই শেষ। আবার বিকেলে ভরলে রাতে শোবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চলতো। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলতো চা নিয়ে।

একদিন কুসুম শরীর ভালো লাগছে না বলে ক্লাসে গেল না, আমি চলে গেলাম। বাংলা ক্লাস শেষে অর্থনীতি ক্লাসে ঢুকবো। ইমপর্টেন্ট ক্লাস। এমন সময় মনে হলো কুসুম রুমে কি করছে? আরে! ও তো আমার চা খেয়ে শেষ করবে। পরে আবার নিচে এসে চা করা, ওরে বাপরে! ছুট লাগালাম হলের দিকে। বেবী, নীপা ওরা চেচাতে লাগলো। আরে আরে, যাচ্ছিস কোথায়? ইকনমিক্স ক্লাসে যাবি না?

তাদেরকে কি করে বোঝাই যে, তার চেয়ে ইমপর্টেন্ট বিষয় নিয়ে চিন্তিত আছি।

কলেজের তিন তলা থেকে দৌড়ে নামলাম। ক্যান্টিন রুমের পেছন দিয়ে শিউলি গাছের নিচ দিয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে পৌছে গেলাম রুমে। গিয়েই দেখি কুসুম এক মগ চায়ের অর্ধেক শেষে মুড়ি ভিজিয়ে খাচ্ছে। এমন সময় আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

আমি হাপাচ্ছি আর তাকে সমানে বকে যাচ্ছি আর নিজের অনুমান সত্য হওয়ায় একজন আত্মবিশ্বাসীর মতো বললাম, আমি জানতাম তোর ফ্লাস্কে চা নেই, আমারটা শেষ করবি। এখন যা, আমার খুব চা খেতে ইচ্ছা করছে। করে নিয়ে আয়। সে চামচের মধ্যে মুড়িটুকু তুলে এনে আমার মুখের সামনে ধরে বললো, নে, মুড়িটুকু খেয়ে এই চাটুকু তুই খেয়ে ফেল। পরে তোকে করে দেবো, সোনা রাগ করিসনে।

তেমন রাগ করছিলাম না। কিন্তু তার আদর মাখা স্বর আমাকে আহ্লাদিত করে ফেললো। আমি না খাবো না, সর! বলে হাত দিয়ে ধাক্কা মারতেই কুসুমের হাত থেকে মগটা পড়ে গিয়ে ঝন ঝন করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ও গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো তার প্রিয় মগটির দিকে।

আমিও বোকার মতো হা হয়ে গেলাম।

কুসুম কোনো কথা না বলে ছোট চায়ের পাতিল, ফ্লাস্ক, চাপাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি তার প্রিয় মগের ভাঙ্গা অংশগুলো জড়ো করে টেবিলের নিচে রাখলাম। মেঝেটা মুছে ফেললাম। চায়ের চেয়ে তার মগটার জন্য আমার কষ্ট লাগছে বেশি এখন। কুসুমের আর্টিস্ট প্রেমিক কুসুমকে মগটি প্রেজেন্ট করেছিল তার জন্মদিনে। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ কি করে করবো? নিজের ওপর খুব রাগ হলো। কুসুম ফিরে আসার আগেই আবার কলেজে চলে গেলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাসটা করতে হবে বলে। সারাক্ষণ মনটা খারাপ হয়ে রইলো। কতো কি পরিকল্পনা যে করেছি তাকে ভোলানোর তার ইয়ত্তা নেই। একদম দুপুর আড়াইটায় রুমে এলাম। এসেই তাকে জড়িয়ে ধরে সরি সরি বলে মাফ চাইতে হবে ভাবতে ভাবতে এসে দেখি সে রুমে নেই।

মম্মিকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো, কুসুমের আর্টিস্ট বন্ধুটি এসেছিল। তার সঙ্গে বাইরে গেছে।

গোসল সেরে খাওয়ার পাট শেষ করে ভাবলাম একটু চা খাই। দেখি ফ্লাস্ক ভর্তি চা।

কিন্তু কেন যেন ইচ্ছা করলো না। ভাবলাম, কুসুম আসুক, এক সঙ্গে খাবো। ঘুম দিলাম একটা। বিকেলেও কুসুম এলো না। সন্ধ্যা হয় হয়, রাত হয়ে গেল। তার পাত্তাই নেই। চা খেতে পারছি না। একটা কষ্ট, একটা অপরাধ বোধ আমার কণ্ঠনালীকে চেপে ধরছে যেন।

তিন দিন পরে একটা চিঠি এলো। কুসুম লিখেছে, মগটা ভেঙেছে দুঃখ নেই। আমরা ভাঙিনি, আমরা বিয়ে করে ফেলেছি, দোয়া করিস।

ঢাকা থেকে

বনবাসে গুড়ো দুধ

- শিরিনতা সাবীন

ময়দা চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার একবারই হয়েছিল। এরপর কানে ধরেছি আর নয়।

তখন সবে ক্লাস ফাইভে পড়ি। গরমের ছুটিতে আমার ছোট ফুপু তার ছেলেদের নিয়ে বাক্স-পেটরা বেধে চলে আসতেন দাদুর বাড়ি। আমাদেরও আবাস দাদুর বাড়িতেই। ফুপুরা এলে চায়ের পর্বে হতো বিরাট হুলুস্থুল। দাদু, ফুপু, মা সকলে মিলে ব্যস্ত হতেন রান্নাঘরে।

একবার মা আমাকে তিনবার বারণ করলেন চায়ে অতিরিক্ত গুড়া দুধ মেশাতে। কারণ গুড়া দুধ খেয়ে ফেলা যেতো ঠিকই কিন্তু ফলাফল পেট ব্যথা। তাই চায়ে বেশি দুধ বারণ।

চা নিয়ে বসে রইলাম মা চোখের আড়াল হওয়ার অপেক্ষায়। কি কারণে জানি মা চলে গেলেন রুমে। আমিও সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য গেলাম রান্নাঘরে।

দাদুর রান্না ঘরের ভেতরেই চাল, ডাল, দুধ এসব রাখার জন্য আলাদা ঘর ছিল। সেখান থেকে উঠিয়ে নিলাম বহু কাঙ্ক্ষিত ডানো টিন। মহাসুখে দুই টেবিল চামচ দুধ মেশালাম। আনন্দে আত্মহারা আমি চায়ে চুমুক দিতেই আনন্দ সব উবে গেল।

একি! চায়ের স্বাদ মহা তিতকুটে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই চিনি কম। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। চিনি মেশালাম। চা মোটামুটি খাওয়ার মতো হলেও কেমন একটা গন্ধ রয়ে গিয়েছিল।

কোনো রকমে চা-টা মাত্র শেষ করেছি, তখনই দাদু প্রবেশ করলেন রান্নাঘরে। পেছন পেছন আমার ছোট ফুপু।

দাদু ডানোর টিনের দিকে দেখিয়ে বললেন, আরে, ময়দার টিন এখানে কেন?

বুঝুন পাঠক, তখন আমার কি অবস্থা!

কোনো রকমে নিজেকে সামলে বললাম, এ এটা, ম-ময়দার টিন, কি-কিন্তু আমি তো ভেবেছি গুড়ো দুধ।

দাদু হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, তুই চা-তে দিয়েছিস?

আমি কাদো কাদো হয়ে বললাম, হ্যা।

হ্যা তো নয়, যেন বোমা ফাটলো। পেছনে দাড়িয়ে থাকা ফুপু হাতের জিনিসি ছুড়ে ফেলে হাসতে লাগলেন।

সেই হাসির শব্দে আমার মা, আমার ছোট বোন, ফুপাতো ভাই দুটো ছুটে এলো।

ফুপু চোখ থেকে পানি মুছে কোনো রকমে পুরো ঘটনা বললেন মাকে।

হাসি সংক্রামক রোগ। সকলের দেখাদেখি নিজের বোকামিতে আমিও হাসা শুরু করলাম।

আসলে পাশাপাশি দুটো ডানোর টিন রাখা ছিল যার একটিতে ছিল দুধ, অন্যটিতে ময়দা। তাড়াহুড়োয় দুধ মনে করে ময়দার টিনই উঠিয়ে এনেছিলাম।

প্রায়ই চায়ের আসরে আমার এই অভিজ্ঞতা হাসায় সবাইকে। সেই থেকে কনডেন্সড মিল্কই ভরসা। আর নয় ময়দা চা। চা তো আর ছাড়া যায় না। তাই গুড়ো দুধেরই হোক বনবাস।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

অ্যাডভেঞ্চার

– আবদুর রহিম

ঘটনাটি অন্তত ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর আগে বাবা ঘটিয়েছিলেন। এ গল্প শুনেছি মেজফুপুর কাছে। দাদার বড় ছেলে হিসেবে বাবা লেখাপড়ায় না আগাতে পারলেও দুষ্টুমি ও বাউণ্ডুলেপনায় গ্রামে সেরা ছিলেন। মূলত আমার মেজফুপুর আশকারা পেয়ে দিন দিন আরো দুঃসাহসী ও দুষ্টু হয়েছিলেন।

সে বছর দাদির কাছে বাবার আবদার, সিলেট চা বাগান দেখবেন। এতোটুকু কিশোরের মুখে এ কথা শুনে দাদি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কতোই বা বয়স, তেরো চোদ্দ হবে। এও জানেন, মানা করলেও লাভ হবে না। তার দুরন্তপনা বাড়বে ছাড়া কমবে না। তবুও দাদার ভয় দেখিয়ে বললেন, এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। পরে মেজফুপুর কাছে গিয়েও তেমন লাভ হয়নি।

ফুপা থাকেন খুলনায়। ফুপুর হাতেও তেমন টাকা পয়সা নেই। তাই বাবাকে নিরাশ হতে হলো। তবুও নিয়ত যখন একবার করেছেনই তখন যাওয়া তার চাই চাই–ই।

পরদাদার (তার বাবা) একমাত্র ছেলে ছিলেন আমার দাদা। সেই সূত্রে প্রচুর আবাদযোগ্য জমি পেয়েছিলেন। জমিগুলোতে সারা বছরই হরেক রকম ফসল দাদা ফলাতেন। এর মধ্যে আখ অন্যতম। তখন চিনির কল বেশি না হলেও দাদা আখের রসকে প্রক্রিয়াজাত করে গুড়ে পরিণত করতেন। তরল গুড় শক্ত হওয়ার জন্য তিন চার ফিট লম্বা ও বিশাল কলসির মধ্যে পুরে তার বাড়ির গুদাম ঘরে রাখতেন। পরে ব্যাপারী এসে এখান থেকে নগদ পয়সায় গুড় কিনে বাজারজাত করতো। গুড়ের কলসি পাহারা দেয়ার জন্য সব সময় কেউ না কেউ গুদামে থাকতো। সেবছর বাবা যেচে গুদাম পাহারার দায়িত্ব নিলেন। আসলে এর পেছনে গভীর রহস্য ছিল। পাহারা দেয়ার আগের দিন তিনি বাজারে তার পরিচিত এক ব্যাপারীর কাছে নিয়মিত দরের তিন চার অংশ কম দামে চব্বিশ কলসির দর করে এসেছিলেন। শর্ত ছিল ব্যাপারীর নিজস্ব লোক এসে রাতের বেলায় কলসিগুলো নিয়ে যাবে।

গুদামে প্রায় পচিশটি কলসি ছিল। যথানিয়মে রাত হলো এবং খেয়ে–দেয়ে বাবা গুদামে এলেন পাহারা দিতে। মধ্য রাতে ব্যাপারীর লোকজন এসে হাজির। এক এক করে চব্বিশ কলসি ঢাকনাশুদ্ধ গুড় উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সদরে আমাদের পারিবারিক কবরস্থান। হঠাৎ রাস্তা পিছলে একজন কলসিশুদ্ধ পড়লো। অন্ধকারে তেমন শব্দ না হলেও কলসির ওপর থেকে একটি ঢাকনা কলসির মুখশুদ্ধ ভেঙে পড়ে রইলো। তড়িঘড়ি করে লোকটি কোনো রকম কলসিটি নিয়ে গেলেও ভাঙা মুখ ও ঢাকনা পড়ে রইলো।

ফজরের আজান হলে দাদা অজু সেরে মসজিদে গেলেন। তখনো মোটামুটি অন্ধকার ছিল। নামাজ সেরে কবরস্থানের পাশ দিয়ে আসতেই দেখেন কলসির ভাঙা মুখ ও ঢাকনা। কি জানি সন্দেহ হতেই দৌড়ে গুদামে পৌছে বুঝতে পারলেন সন্দেহ অমূলক নয়। তার নালায়েক বেটা (আমার বাবা) একটি কলসির মুখ জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। বাকি চব্বিশ কলসি গায়েব।

চোরে নিয়ে গেল বলে বাড়িশুদ্ধ মাথায় তুললেন। বাবার ঘুম ভাঙলে তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করতেই স্পষ্ট জবাব, জানি না।

বাবা হরেক রহম দুষ্টুমি করলেও এতো দুঃসাহস তার হবে এতোটুকু বিশ্বাস দাদা–দাদি উভয় করতেন না। পড়ে গেল হই চই। এ যে সে চোর না, চোরের বড় গ্রুপ হতে পারে।

বিকেলে বাজারে গিয়ে বাবা ব্যাপারীর কাছ থেকে টাকা বুঝে নিলেন। ফলে এবার চা বাগান দেখা নিশ্চিত।

এতো কিছু পরও কিভাবে জানি দাদা রাতের আগে জেনে গেলেন গুড়ের কলসি কোন ব্যাপারীর কাছে আছে। বুঝতে বাকি রইলো না এসব কার কারসাজি। বড় আকারের এক ডাণ্ডা নিয়ে এলেন বাবাকে শায়েস্তা করবেন বলে।

বাবাও চালাক কম নন। কিভাবে টের পেয়ে রাতেই টাকাশুদ্ধ পালালেন।

বাড়ি এসে বাবাকে না পেয়ে দাদিকে আচ্ছা বকাঝকা করলেন।

এবার পুত্রধনকে খোজার পালা।

বাবাও রাতেই স্টেশনে হাজির। এবং ফেনী–সিলেটগামী মেল ট্রেনে চড়ে বসলেন ও চা বাগান দেখতে বেরিয়ে গেলেন।

দাদা অনেক খোজাখুজি করে মেজফুপুর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সব কথা বেরিয়ে এলো। তিনি আর হই চই করলেন না। নতুবা গ্রামে নাম খারাপ হবে।

চোদ্দ পনেরো দিন সিলেটের নানান জায়গা ঘুরে টাকায় টান পড়ার আগেই ফিরতি ট্রেন ধরলেন। স্টেশনে নামতেই কাকতালীয়ভাবে মেজফুপার সঙ্গে দেখা। ঢাকা হয়ে খুলনা থেকে ফিরেছেন।

ফুপুর মতো ফুপার সঙ্গেও বাবার বেশ ভাব ছিল। তাই তার সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। পরে দাদাকে খবর দেয়া হলেও ফুপার জোর আপত্তির কারণে বাবাকে ওই যাত্রায় দাদা কিছুই করতে পারলেন না এবং বাবাশুদ্ধ বাড়ি ফিরলেন।

এখন যাতায়াত ব্যবস্থা এতো উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আজও সিলেট চা বাগান আমার দেখা হয়নি। বাবাকে বললেও তিনি আজ নয়, কাল করে আর যাওয়া হয়নি।

বাবা আজ নেই। তবুও এতো বছর পর ফুপুর মুখে শোনা এ গল্প কোনো কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চার থেকেও বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস বলে মনে হয়।

আল আইন, ইউএই থেকে

rahim7335318@yahoo.com

প্রকারভেদ

– আবু মুছা আবদুল্লাহ

পান উপযোগী চা মোট তিন প্রকার। তবে কারো কারো মতে, চা চার প্রকার। কোনো কোনো চাখোরের মতে চা আবার পাচ প্রকার। নিচে চায়ের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো।

এক. **লাল চা**

যে চা পানি, চায়ের পাতি বা গুড়া ও চিনির সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় তাকে *লাল চা* বলে। এ চায়ের উপকারিতা থাকলেও বেশি পান করলে অনেক ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, এমনকি রক্ত আমাশয়ও হতে পারে।

দুই. **লেবু চা**

যে চা পানি, সামান্য লেবুর রস ও চিনির সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় তাকে *লেবু চা* বলা হয়। লাল চায়ের চেয়ে লেবু চা কিছুটা ভালো।

তিন. **দুধ চা**

যে চা দুধ, চিনি ও পানির সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় তাকে *দুধ চা* বলে। দুধ চা সবচেয়ে ভালো। তারপরও বেশি বেশি চা পান ঠিক নয়। দিনে এক কাপ চা পান করা স্বাস্থ্যসম্মত। তাও আবার খাবারের তিন ঘণ্টা আগে

বা পরে হওয়া উচিত। না হলে পেটে অম্ল বা অর্জিন রোগ সৃষ্টি হতে পারে। মিষ্টি খাওয়ার আগে ও পরে চা পান ঠিক নয়। এতে করে পেটে গ্যাস হতে পারে।

চার. **শরবত চা**

যে চা প্রস্তুতকারী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঠাণ্ডা করে প্রস্তুত করে থাকে এবং চা পানকারী মনের দুঃখে এক গ্লাস ঠান্ডা জলে মিশিয়ে সেবন করে থাকে তাকে *শরবত চা* বলা হয়। এ চায়ের তেমন কোনো উপকার নেই।

পাচ. **ভেজাল চা**

এই চা উল্লিখিত চাগুলোর মতো পান উপযোগী করা হয়। কিন্তু এই চায়ে রাসায়নিক বা জৈবিক কিংবা যে কোনো ধরনের ভেজাল দেয়া হয়।

যেমন অজ্ঞান পার্টি রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেয়। তাছাড়া সেক্সুয়াল কারণেও ভায়াগ্রা বা ইয়াবা ভেজাল দিয়ে যৌন উত্তেজিত করার মানসে পান করানো হয়ে থাকে। কেউ কেউ তার বন্ধুকে কিংবা আত্মীয়স্বজনের শ্বাস কষ্ট বা হাপানি রোগ সারাতে গোপনে চায়ের মধ্যে তেল কাকড়া ভেজাল দিয়ে থাকে।

আনন্দনগর, নওগা থেকে

কথকতা

- মিলন রশীদ

উপকথা

এক ইনডিয়ান নরপতি বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্ম প্রচারের জন্য পদব্রজে ইনডিয়া থেকে চায়না যাচ্ছিলেন। মাঝ রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়ে ভাবলেন ছিঃ ছিঃ, চোখের পাতা দুটোই তার চোখকে ঢেকে দিয়েছিল। যেই না ভাবা অমনি চোখের দুটো পাতা কুচুৎ করে কেটে ফেলে দিলেন। ভগবান বুদ্ধের বরে তারা হয়ে গেল গাছের পাতা। সেই গাছটিই হল চা গাছ। সেই থেকে বৌদ্ধদের মধ্যে ক্লান্তিনাশক হিসেবে চায়ের চলাচল। এ হলো পাতার গল্প। কিন্তু কুড়ি এলো কোথা থেকে?

চা জনপ্রিয়তা পায় যেভাবে

এক সময়ে বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয় পানীয় ছিল কফি। জনপ্রিয় এ পানীয়কে ঠেলে দিয়ে কিভাবে চা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো? এর পেছনে ছিল বৃটিশ কৌশল। চায়ের নেশা মানুষের মাঝে প্রবেশ করানো। এবং চায়ের বিক্রি বাড়ানোর জন্য বৃটিশরা বিনা পয়সায় চা খাওয়াতো। নদী পারাপার থেকে লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা, ট্রেনে চড়লে বিনা পয়সায় চা দিতো। মহিলারাও চা পান করতো। কফি সরবরাহ ছিল প্রচুর। তবে কফির জনপ্রিয়তা তখনই হ্রাস পেতে শুরু করে। কফির স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করে নেয় চা।

বৃটিশদের বিজ্ঞাপনী কৌশল

বৃটিশরা শুধু বিনা পয়সায় চা পান করিয়েই ক্ষান্ত রইলো না। তারা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করতে লাগলো। শীতে চা পান উপাদেয় হলেও গরমকালে যাতে বিক্রি অব্যাহত থাকে তার জন্য ব্যাপক প্রচারে বিজ্ঞাপনে বলা হতো, *গরমে গরম ক্ষয় হবে, গ্রীষ্মকালে একমাত্র শীতল পানীয় চা।* বিজ্ঞাপনে আরো ছিল, *প্রাণশক্তি ও উৎসাহের উৎস এবং ম্যালেরিয়ানাশক চা। সারা দিনের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম বা মাথার কাজের পর এক কাপ ভালোভাবে তৈরি চা পান করলেই শরীর সজীব ও মন প্রসন্ন হয়ে উঠবে। সত্যিই চা জাগ্রত জীবনী শক্তির ভাণ্ডার।*

সকালবেলা নিয়ম করে অন্তত দুই কাপ ভালো দেশি চা রোজ পান করুন। জড়তা দূর হয়ে যাবে। সমস্ত দিন শরীর মজবুত থাকবে। আবার দিনের শেষে দুই কাপ চা পান করবেন। সারা দিনের খাটুনির পর মধুর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে না। এ সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো। এখন আর চা পানের জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না।

চায়না জাপানের পরীক্ষাগারে চায়ের গুণ- নির্গুণ

চায়না ও জাপানের পরীক্ষাগারে চায়ের কিছু গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। গৃন টি থেকে প্রস্তুত ট্যাবলেট বহুল ব্যবহৃত হয় জাপানে ব্লাড প্রেশারের ওষুধ হিসেবে। চায়নায় গৃন টি ব্যবহৃত হয় টুথপেস্টের উপকরণে। চা–এ ক্যান্সার নিরোধক গুণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে সাধারণ মানুষ দোষগুণের বিচার না করেই চা পান করে।

চায়ে রয়েছে তিন ধরনের উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ। সেগুলা হলো – ক্যাফেইন, থিওব্রোমিন ও থিওফাইলিন। এ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমেই চা বিভিন্ন প্রকার রোগ দমনে এবং নিরাময়ে সাহায্য করে। সর্দি এবং হাপানির চায়ের উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ ফুসফুসের সংকোচন রোধ করে এবং ফুসিলের প্রসারণে সহায়তা করে। এতে শ্বাস–প্রশ্বাস সহজ হয় যা হাপানি রোগীদের জন্য আরামদায়ক। সর্দি–কাশির ক্ষেত্রে শ্বাসনালী থেকে মিউক্যাস নামের পদার্থ দূরীভূত করার মাধ্যমে চা রোগের উপমশ করে থাকে।

চায়ে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ফ্লোরাইড, যা দাতের ক্ষয়রোধে কার্যকরী। উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াও চায়ে রয়েছে ট্যানিন। ট্যানিন মুখগহ্বরে অবস্থিত দাতের ক্ষয়ের জন্য দায়ী ব্যাকটোরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে। ফলে ক্ষয়রোগ থেকে দাত রক্ষা পায়।

ট্যানিন অন্ত্র ও পাকস্থলিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে ডায়রিয়া দমন সহজ হয়। অধিক মাত্রায় এক্স–রে এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে শরীরের কোষের যে ক্ষতি সাধিত হয় সে ক্ষতি পূরণে চা সহায়তা করে। চায়ের ট্যানিন নামের রাসায়নিক পদার্থের *কেটেচিন* নামের উপাদানটির মাধ্যমে শরীরের কোষের তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি দমনে চা কাজ করে। স্টনসিয়াম ৯০ নামের তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে শরীরের অস্থি–মজ্জায় প্রবেশে বাধা দিতে সাহায্য করে।

যারা তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত তাদের ক্যান্সার প্রতিরোধে চা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চায়ের সর্বনাশা চরিত্রও চিহ্নিত করেন বিভিন্ন চিকিৎসক। চিকিৎসকদের মতে, অতিমাত্রায় চা পান বদহজম, হৃদস্পন্দন, শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা প্রভৃতি নানান রকম উপদ্রবের সৃষ্টি করে।

এছাড়া স্নায়ুবিকারের যতোগুলো কারণ বিদ্যমান আছে এর মধ্যে ক্যাফিন নামের মাদকদ্রব্যের নিয়মিত ব্যবহার অন্যতম। চা ও কফিতে ক্যাফিন রয়েছে। বেশি চা পান করলে অম্ল, পেট কামড়ানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, ক্ষিধেমন্দা ও হৃদযন্ত্রের নানান রকম বৈকল্য ঘটে। ফলে চা একেবারে নির্গুণও নয়।

চায়নিজদের কাছে চা নেশা দ্রব্য

বিশ্ব জুড়ে পানীয় হিসেবে চা খুব জনপ্রিয়। চায়নার ভেষজ চিকিৎসা ক্ষেত্রে চা ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে। কিন্তু চা নামটা কিভাবে এলো আর কিভাবে বিস্তৃতি এ নিয়ে রয়েছে নানান কথা।

চায়ের অন্য কোনো ভালো নাম নেই। একমাত্র শব্দ *চা*, বৃটিশরা বলে *টি* আর চায়নিজরা বলে *বহিরা*। ভারতবর্ষে চা আসার আগে চায়নায় প্রচলিত ছিল। এ উপমহাদেশে চায়নায় প্রথম চায়ের প্রচলন হয়। চায়নায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে সেকালে তাদের নেশা করার মানসিকতা। চায়নিজরা নানান রকম নেশাদ্রব্য গ্রহণ করতো। সে থেকে চা–কে তারা সহজভাবে নেশা হিসেবে গ্রহণ করে। সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে চা ছিল সীমাবদ্ধ।

সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্মানের চিহ্ন চা

১৬৬২ সালে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্মানের চিহ্ন হিসেবে চা পান করা হয়েছিল। চা এসেছিল বিদেশ থেকে। ১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ইনডিয়ায় চা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তিনিই প্রথম। এর আগে কেউ-ই চা চাষের কথা ভাবেননি। ১৭৮৮ সালে স্যার জোসেফ ব্যাংকস বোটানিকাল গার্ডেনে কিছু চা গাছ লাগিয়ে সেখানে চা চাষের সম্ভাবনা আছে কি না দেখেছিলেন। তিনি সরকারকে জানিয়েছিলেন হিমালয়ের পাদদেশে আছে চা চাষের উপযোগী মাটি ও আবহাওয়া।

১৮৮৭ সালে কলকাতা বন্দরে আমেরিকান জাহাজ নোঙ্গর করে। চায়না হয়ে জাহাজটি আসায় অনেক কিছুর সঙ্গে চাপাতাও আনা হয়েছিল। যেহেতু চায়নায় চায়ের প্রচলন ছিল সেহেতু ওয়ারেন হেস্টিংস চা চাষের জন্য চায়না থেকে বীজও এনেছিলেন। চায়নিজরা সব সিদ্ধ বীজ হেস্টিংস-কে দিয়েছিল। ফলে এতে আর গাছ হলো না। চায়ের ব্যাপারে চায়নিজদের খুব উন্নাসিকতা ছিল। তারা মনে করতেন, বুদ্ধদেবের চোখের পাতা থেকে চা গাছের জন্ম। এ কারণে চায়ের সঙ্গে ঘুম না হওয়ার প্রসঙ্গটা জড়িয়ে আছে।

আসামে চা

১৮২৩ সালে মেজর রবার্ট ব্রুস আসামে দেখেন চায়ের গাছ আছে। তিনি তা সমতলে নিয়ে আসেন নমুনা হিসেবে। তার চা গাছ দেখেই বৃটিশ সরকার চা চাষে উদ্যোগী হয়। তখন লর্ড বেন্টিংয়ের শাসন আমল শুরু হয়।

১৮৩৪ সালে ইনডিয়ায় চা উৎপাদনের ব্যাপারে একটি টি কমিটি গঠিত হয়। এতে দুজন ইনডিয়ান সদস্য ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। এদের রাখার কারণ ছিল ব্যবসায়িকভাবে সাহায্য এবং দেশবাসীর সমর্থন পাওয়া।

অবশেষে আসামে চা চাষ শুরু হয়। আসামের শেষ রাজা যিনি রবার্ট ব্রুসের হাতে চা গাছ নমুনা স্বরূপ তুলে দিয়েছিলেন সেই দেওয়ান মণিরাম দত্ত বড়ুয়া তার নিজের বাগানে চা চাষ শুরু করেন। তিনিই প্রথম ইনডিয়ান যিনি চা গাছ লাগিয়েছিলেন।

পৃথিবীর প্রথম চা কম্পানি আসামে

১৮৩৮ সালে প্রথম চা রফতানি করে ইনডিয়া। ইংরেজরা বাইরে থেকে চা এনে এখানে চাষ করে বৃটেনে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। সে কাজ সঠিক পদ্ধতিতে সমাধা করার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রথম চা কম্পানি *দি আসাম কম্পানি* ১৮৩৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয়।

পৃন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মতিলাল শীল ছিলেন কম্পানির দুই ডিরেক্টর। প্রথম চা কম্পানির ডিরেক্টর দ্বারকানাথের উদ্যোগেই জন্ম নেয় *বেঙ্গল টি এসোসিয়েশন*। চায়ের প্রথম নিলাম হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৮৬১ সালে। ১৮৮৬ সালে গড়ে উঠেছিল ৪১ সদস্যর চা ব্যবসায়ী সংঘ *ক্যালকাটা টি* ট্রেডার্স এসোসিয়েশন।

হবিগঞ্জ থেকে

গরম

- মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ

চা এখন ছোট-বড়, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের প্রিয় পানীয়। এমন এক সময় ছিল যখন বিশেষ শ্রেণীর মানুষই চা পান করতো। চা ছিল ভদ্রতা ও আভিজাত্যের প্রতীক। আমার শোনা এ রকম সময়ের দুটি ঘটনা আজ লিখবো।

এক.

আমার স্কুল জীবনের প্রিয় শিক্ষক নজরুল ইসলাম স্যারের চাচা গ্রামের ধনী কৃষক। মাগুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস। জীবনে গ্রাম ছেড়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত যাননি। সেই চাচা একদিন কাজের প্রয়োজনে মাগুরা শহরে গেলেন। ঢাকা রোডে বড় বড় বাস-ট্রাক দেখে তিনি বিস্মিত।

বাড়ি ফিরে সবাইকে সেই বিস্ময়কর বস্তুর বর্ণনা দিলেন। অবাক কাণ্ড! মাগুরা গিয়ে রাস্তায় দেখলাম বড় বড় রেলগাড়ি হু হু করে চলছে। আসলে মাগুরায় কোনো ট্রেন লাইন নেই।

সেই চাচা বর্ষাকালে ক্ষেত-খামারে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা, কাশি, গলা ব্যাথা বাধিয়ে ফেললেন। শিক্ষিত ভাতিজার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিলে স্যার বললেন, বাজারে নিতাই-এর চায়ের দোকান থেকে কড়া করে এক কাপ চা খেলে আপাতত গলা ব্যথায় ভালো লাগবে।

সেই মোতাবেক চাচা নিতাইয়ের চা দোকানে গিয়ে কড়া করে এক কাপ চা দিতে বললেন।

নিতাই অতি যত্ন সহকারে চাচার জন্য চা তৈরি করে দিল।

চাচা শরবতের মতো এক চুমুকে চা পান করতে গিয়ে মুখ, জিভ সব পুড়িয়ে ফেললেন।

পরিণতিতে নিতাইয়ের মুখে পড়লো বিশাল এক থাপ্পড় এবং কাপ ভাংচুর।

চিৎকার করে চাচা বললেন, হারামজাদা, তোর সাহস তো কম না, চেনা-জানা লোক হয়ে তুই গরম চা দিস। জানিস আমি *কি ডা?*

চা যে গরম খেতে হয়, জীবনে চা পান না করায় চাচার জানা ছিল না। দোকানে উপস্থিত অন্য সবাই চাচাকে শান্ত করে সেই যাত্রা নিতাইকে রক্ষা করে।

দুই.

আমার প্রয়াত পিতার জীবনের ঘটনা। বৃটিশ আমল। কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাবা গোয়ালন্দ ঘাটে অপেক্ষা করছেন। মাঘ মাসের গভীর রাত। প্রচণ্ড শীতে সকলের হাত পা ঠাণ্ডায় অবশ অবস্থা।

এর মধ্যে চা গরম, চা গরম ডাক শুনে বাবার চা পানের ইচ্ছা হলো। তিনি চা বিক্রেতাকে গরম চা দিতে বললেন। কিন্তু চায়ের কাপে হাত দিয়ে গরম বোধ না হওয়ায় বাবার মন খুব খারাপ হলো। পয়সা দিয়ে কেনা চা ফেলে না দিয়ে খেয়ে ফেলাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

যখনই অবহেলায় চা মুখে দিয়েছেন, গরমে তার পুরো মুখ ঝলসে গেল। বাবা পুরোদমে বোকা হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড শীতে হাত পা ঠাণ্ডা থাকায়, চায়ের গরম বুঝতে না পারায় এই বিপত্তি।

হাজারিবাগ, ঢাকা থেকে

পর পর তিন কাপ

- এমএ মালেক

চা পান নিয়ে আমার জীবনের দুইটি ঘটনা স্মৃতিপটে এখনো বিশেষভাবে বিদ্যমান। একটি হলো যখন ক্লাস টু-র ছাত্র। ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আনন্দবাজার থেকে বাবা সামান্য বাজার করে দিয়ে বললেন, সোজা বাড়িতে চলে যাবে।

চলার পথে দেখতে পেলাম চালপট্টির পশ্চিম দিকে খালি জায়গায় কিছু লোকের ভিড়। দেখলাম একটি মোটা রশি দিয়ে গোলাকার সীমানা নির্ধারণ করে কোণায় রাখা বড় একটি পাতিলে গরম পানিতে কালিজিরার মতো

কালো রঙের কিছু ছোট দানা দেয়ার পর একটি কাপে পরিমাণ মতো খয়েরি রঙের পানি সামান্য দুধ ও চিনি মিশিয়ে সবাইকে খেতে দিচ্ছে।

আমারও কেন যেন খেতে ইচ্ছা হলো। এক সময় সত্যিই আমাকেও এক কাপ খেতে দিল। দারুণ মজা ও উত্তেজনা। প্রথম চুমুক দিয়ে বুঝতে পারলাম এ জিনিস তো আমি আর কখনো পান করিনি। বেশ সুন্দর ঘ্রাণ, কিছুটা তিতা আবার মিষ্টিও লাগছে।

লোকটি বললেন, খোকা, আস্তে আস্তে খাও, নচেৎ জিভ পুড়ে যাবে। পয়সা লাগবে না।

যতোই পান করছি ততোই মজা আর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একটা আনন্দ ভাব।

কাপটি ফেরত নেয়ার সময় লোকটি একটি প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই প্যাকেটটির ভেতর এ মজার খাবারটি আছে এবং কিভাবে তৈরি করবে তাও লেখা আছে। তোমার মায়ের হাতে দিও।

আমার পীড়াপীড়িতে মা লেখা নিয়মে বানালেন বটে কিন্তু সেই মজা হয়নি। এখনো ওই দিনের বিনা পয়সার চা পানের ব্যাপারটি স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে আছে।

দুই. পরবর্তী ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের। যেকোনো কারণে রাত বারোটার পর নানান রকম ভয়-ভাবনায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে প্রথমে হাটাপথে মাদারটেক। সেখান থেকে নন্দীপাড়া হয়ে শেখেরগাও পর্যন্ত পৌছালাম। রাত কাটলো নানান রকম খবরাখবর সংগ্রহে এবং আতংকের মধ্যে। ২৮ মার্চ শেখেরগাও থেকে হাটাপথে ডেমরার বাসস্ট্যান্ডে পৌছে বাসে নরসিংদী। সেখান থেকে লঞ্চে নবীনগর হয়ে নিজ বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যপাড়ায় পৌছালাম ২৯ মার্চ সকালে।

চলার পথে টেনশনে অনেক কাপ চা পান করেছি। এটা আমার অভ্যাস। অবশ্য এতোবার চা পান করাতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমি যে চাখোর মানুষ!

কয়েকদিন পর হঠাৎ খবর এলো হানাদার বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রেললাইন দিয়ে হেটে এগিয়ে আসছে। এই খবরে শহরের মানুষজন যে যার মতো আশ্রয়স্থলে চলে গেল। কেউবা সাহস করে নিজ বাড়িতেই রয়ে গেল।

বাড়ি ঘরের তেমন ক্ষতি না করলেও বেশ কিছু লোককে অযথা গুলি করে মারলো এবং তিতাস নদীর পাড়ের বাজারগুলোতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল।

এদিকে চাকরিতে জয়েন করার জন্য রেডিওতে পর পর কয়েকবার ঘোষণা দিচ্ছে। জয়েন না করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাধ্য হয়েই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে গ্রামের বাড়িতে রেখে মা বাবার দোয়া নিয়ে ঢাকার দিকে একা রওনা হলাম।

গোকর্ণঘাটে পৌছে টেনশনে পর পর দুই কাপ চা পান করায় মনে হলো শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়েছে। সাহস করে অনেকজনের সঙ্গে একটি ছৈ বিহীন নৌকায় উঠে বসলাম। সবাই অপরিচিত। যথাসময়ে নবীনগর লঞ্চঘাটে পৌছে আবারও বিস্কিটসহ এক কাপ চা পান করলাম।

পরিচিত কাউকে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই হঠাৎ দেখা পেলাম মানিক সাহা নামের এক অফিস বন্ধুর। একই অফিসে (ইপিআইডিসি) চাকরি করি।

তিনি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি হাত মিলিয়ে বললেন, দাদা, আমি অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছি, পরিচিত কাউকে পেলাম না। শুনতে পেলাম প্রথমে নরসিংদী এবং পরে ডেমরাঘাটে আর্মিরা প্রত্যেককে চেক করে দেখে মুক্তিফৌজ কি না। সন্দেহ হলে ক্যাম্পে আটকে রাখে। পরে নাকি তাদের আর কোনো খোজখবর পাওয়া যায় না।

তিনি আরো বললেন, আমার নাম বললেই বুঝে ফেলবে আমি হিন্দু। চাকরিতে জয়েন না করেও আমার কোনো উপায় নেই। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, বৃদ্ধ মা বাপ, নাবালক দুটি ছেলেমেয়ে। আমিই তাদের একমাত্র অবলম্বন। এখন আমি কি করি?

কয়েক মুহূর্ত অনেক কিছু ভাবলাম। আরো ভাবলাম, বিপদে বন্ধুর পরিচয়। তাই ধীরভাবে বললাম, দাদা, একদিনের জন্য না হয় মানিকের স্থলে মোহাম্মদ কুদ্দুস নাম রেখে চলুন রওনা দিই। কারণ আমাকেও যেতেই হবে। লঞ্চ ছাড়তে একটু দেরি আছে। চলুন এক কাপ চা পান করে নিই, মন চাঙ্গা হবে।

যথাসময়ে লঞ্চে নরসিংদী পৌছালাম এবং লাইনে দাড়ানোর পর সাধারণভাবে চেক করে ছেড়ে দিল।

তারপর বাসে যখন ডেমরা ঘাটে পৌছলাম তখন বিকাল পাচটা হবে। বিরাট লাইন। এক একজনকে অনেক সময় নিয়ে সমস্ত শরীর চেক করছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই চুপচাপ দাড়িয়ে। দুজন আর্মি এসে চক্কর দিয়ে গেল। মানিকবাবুর চেহারা বিবর্ণ। সবাইকে এক এক করে একটু দূরে নিয়ে নানান রকম প্রশ্ন করছে এবং আইডেন্টিটি কার্ডের ফটোর সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে নিচ্ছে। কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে। কাউকে আবার ক্যাম্পের ভেতর নিয়ে যাচ্ছে। ভয় লাগারই কথা। মনে মনে কলেমা পড়তে লাগলাম আর ভাবলাম এই অবস্থায় ঘাবড়ালে মানিকবাবুকে নিয়ে মহাবিপদে পড়বো।

তাই আমি সামনে আর বাবু পেছনে। আমার পালা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার নাম বলে আইডেন্টিটি কার্ডটি বের করে দিলাম এবং আবারও সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেললাম, *ইয়ে মেরা দোস্ত হ্যায়, একই দফতর মে নোকরি করতা হ্যায়, উসকো ডান্টি কার্ড হারা গিয়া।*

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলাতে এবং আমার মুখের দাড়ি ও মাথার টুপির দিকে বার বার তাকিয়ে এবং আমার ভাঙা ভাঙা উর্দু কথা শুনে বোধহয় বেশ খুশি হয়েছে। ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভেবে আর্মিটা বললো, ঠিক হ্যায়, আগে বাড়ো, ঠিকসে নকরি করো।

তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সামনে একটু দূর এসে মানিকবাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদেই ফেললেন এবং বললেন, দাদা, আপনার মনমানসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসে আমি নতুন জীবন ফিরে পেলাম।

তার কথায় আমিও কেদে ফেললাম। এর মধ্যে গলা শুকিয়ে এসেছে। পথের ধারে একটা চায়ের দোকান দেখে খুব খুশি মনে দুজনে চা পান করতে বসলাম।

এক পর্যায়ে বাবু বললেন, যদি সন্দেহবশে আর্মিটা দুজনকেই ক্যাম্পের ভেতর নিয়ে যখন দেখতো যে আপনার কথা মিথ্যা এবং আমি একজন হিন্দু তখন আমি তো মরতামই, আপনাকে মুক্তিফৌজ হিসেবে গণ্য করে অবশ্যই মেরে ফেলতো। কে কার খবর রাখতো! যাক দাদা, আপনি প্রমাণ করলেন, আসলে এই দেশের হিন্দু–মুসলমান এক অপরের ভাই এবং অসাম্প্রদায়িক।

দুই কাপ চা খাওয়া শেষে উঠতে যাবো। এই সময় বললাম, দাদা, পর পর দুই কাপ চা খেলাম, বেশ ভালো লাগছে, চলুন আরেক কাপ চা খাই বিস্কিটসহ।

দুজনেই হেসে ফেললাম এবং তৃতীয় কাপ চা পান করে হাত ধরাধরি করে সামনে দাড়ানো বাসটিতে উঠে বসলাম।

পাচ মিনিটে এক বসায় তিন কাপ চা খাওয়া আমার জীবনে একবারই ঘটেছিল।

দেশ স্বাধীন হলো, ইপিআইডিসি কয়েকটি কর্পরেশনে ভাগ হলো। দুজন ভিন্ন ভিন্ন কর্পরেশনে চলে গেলাম। পরবর্তীকালে দেখা হলেই বাবু হাসতে হাসতে বলতেন, দাদা, এই যে দেখুন আপনার মোহাম্মদ কুদ্দুসকে, এখনো বেচে আছি। তারপর একটু মুচকি হেসে চোখ মটকে রসিকতা করে বলতেন, দাদা, চলুন আবার এক বসায় তিন কাপ চা খাই। মিষ্টি দুধের উৎকৃষ্ট চা, যাতে নতুন জীবন লাভ করতে পারি।

কথাগুলো শুনে গর্বে ও আনন্দে বুকটা ভরে উঠতো। এ জাতীয় সহযোগিতার ঘটনা উভয় সম্প্রদায়ের অনেকের জীবনেই ঘটে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করি। অথচ ওই পারের কিছু রাজনৈতিক দানবকুলের আচরণে এবং গুজরাটে মুসলমানদের অবস্থা মনে হলে সত্যিই কষ্ট হয়।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছি ১৯৯০ সালে। মানিকবাবু বোধহয় এর তিন বছর পর। এরপর আর দেখা হয়নি। জানি না মানিকবাবু বেচে আছেন কি না? জানতে ইচ্ছে করে।

মানিকবাবু, ঢাকায় থাকুন অথবা দেশের বাড়ি নবীনগরই থাকুন, কোনোভাবে যদি লেখাটি আপনার হাতে পড়ে তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

কয়েকদিন আগে এক অবসরপ্রাপ্ত বন্ধু আমার বাসায় গল্প করার মানসে প্রায় দুপুর একটা পর্যন্ত নানান রকম কথাবার্তা বলেও ওঠার কোনো তাগিদ দেখতে না পেয়ে বলেই ফেললাম, দোস্ত, আজান তো হচ্ছে, আর কতো, আরো এক কাপ চা খাবেন না কি?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, এনি টাইম ইজ টি টাইম। হ্যা, খেতে পারি।

বাসাবো, ঢাকা থেকে

রমেশের দোকান

– রুমকী আখন্দ

শাফির সঙ্গে আমি যতো জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, অন্য কারো সঙ্গে ততো জায়গায় ঘুরে বেড়াইনি। আমার বান্ধবীদের মধ্যে তুলি তো ভেবেই নিয়েছে যে, শাফি আর আমি বোধহয় প্রেমিক-প্রেমিকাই। ওকে বলেও ওর ভুল ভাঙাতে পারিনি।

তুলির কথা হলো, প্রেমিক-প্রেমিকাই যদি না হবো তাহলে শাফির সঙ্গে আমি এতো জায়গায় ঘুরে বেড়াই কেন?

তুলিকে বলেছি, তুলি যেমন আমার বান্ধবী তেমনি শাফিও আমার খুব ভালো বন্ধু। ঘুরে বেড়াতে শাফির খুব ভালো লাগে। আমারও ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে। তবে আমি সব সময় ঘুরে বেড়াতে পারি না বা খুব বেশি দূরেও বেড়াতে যেতে পারি না। কারণ আমি মেয়ে।

মা তো বলেই দিয়েছেন, মেয়েদের বেশি ঘুরে বেড়াতে নেই। বেশি ঘুরে বেড়ালে বদনাম হয়।

একটু দূরে গেলে মাকে বলি যে, বান্ধবীরা মিলে যাচ্ছি। শাফির কথা বলি না। আর কাছাকাছি হলে তো মাকে বলিই না। কারণ সেদিন কলেজ কামাই করে কলেজ টাইমের ভেতরে বাসায় চলে আসি।

শাফির সঙ্গে আমি কমল রানীর দীঘি, নবাব আলী আমজাদ-এর বাড়ি, বিটিআরআই, শীতেষ বাবুর চিড়িয়াখানা, স্লুইস গেট, কৃশ্চিয়ান মিশন, মাধবপুর লেকসহ বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি।

কৃশ্চিয়ান মিশনে ও যেতে চায়নি। দুবার বলার পর ও না করেনি।

এতাদিন ধরে শাফির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবুও শাফিকে ঠিক মতো বুঝতে পারিনি। ও আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর প্ল্যান করলে সঙ্গে তৃতীয় কাউকে রাখে না। শুধু আমরা দুজন ঘুরে বেড়াই। আমি শাফিকে খুব বিশ্বাস করি।

শাফি যখন কোথাও বেড়াতে যেতে চায় তখন যদি আমি না করি তাহলে ওর চোখ-মুখ অন্য রকম হয়ে যায়। একেবারে বাচ্চাদের মতো গাল ফুলিয়ে বসে থাকে। তখন আমাকে হ্যা বলতে হয়।

শাফিকে বলা আছে, বেশি দূরে কোথাও যেতে পারবে না, যেখানে সারা দিন চলে যায়। কেননা মা অবশ্যই দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। ঝামেলা হবে।

শাফি বলেছে, আরো কিছুদিন পর ও আমাকে কুয়াকাটা নিয়ে যাবে। তখন যেভাবে পারি কুয়াকাটা যাবার অনুমতি দেয়ার জন্য যেন পরিবারের সদস্যদেরকে রাজি করাই। বরিশালে ওর এক বন্ধু আছে। বরিশাল যাওয়ার পর সেখান থেকে ওর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনজন এক সঙ্গে কুয়াকাটা গিয়ে সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত দেখবো।

আমি না করিনি।

শাফি বলেছে, কুয়াকাটা যাবার জন্য প্রথমে সদরঘাট থেকে লঞ্চে বরিশাল যাবে। তবে মে–জুন–জুলাই এই তিন মাস লঞ্চে উঠবে না। লঞ্চ ডুবির ভয় আছে। এই তিন মাস ছাড়া অন্য যে কোনো মাসে আমাকে নিয়ে কুয়াকাটা যাবে।

শাফির সঙ্গে যতো জায়গায় বেড়িয়েছি সব দিনের তারিখ, বার, সময়সহ সব বর্ণনা আমার ডায়রিতে লিখে রেখেছি যাতে যখন বৃদ্ধ হবো তখন সে ডায়রি পড়ে সময় কাটাতে পারি।

২০০৪ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে শাফি আমাকে বলেছিল আমাকে নিয়ে শ্রীমঙ্গল যাবে। শ্রীমঙ্গলে ওর সঙ্গে আমি আরো গিয়েছি। শীতেষ বাবুর চিড়িয়াখানা, বিটিআরআই এসব দেখেছি। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এবার কি দেখাবে?

ও বলেছিল, এবার দেখাবে না, খাওয়াবে। চা খাওয়াবে।

শাফির কাছ থেকেই জেনেছিলাম, শ্রীমঙ্গলে একটি চায়ের দোকান আছে। সেখানে আট রকমের চা পাওয়া যায়। সে চা খেতে আগ্রহী হয়েছিলাম।

পরদিন আমি ও শাফি রওনা হলাম। সঙ্গে শাফির চাচার গাড়ি। গাড়ি ড্রাইভারই চালাচ্ছে।

শাফির চাচারা ইংল্যান্ড থাকেন। ওদের সব কিছু দেখাশোনা করার দায়িত্ব শাফির।

গাড়িতে বসে শাফি জানালো, শ্রীমঙ্গলে রমেশের দোকানে আট রকমের চা পাওয়া যায়। শাদা চা, আদা চা, লেবু চা ছাড়া চার রকমের দুধ চা। কালার চা–র জন্যই নাকি অনেক লোকের ভিড় হয় রমেশের দোকানে। কালার চা–র নিচের অংশে থাকে আদা চা এবং উপরের অংশ থাকে লাল চা। একটা পাত্রে তেল এবং পানি থাকলেও যে রকম এক সঙ্গে মেশে না, রমেশের কালার চা–র দুই অংশ নাড়ালেও এক সঙ্গে মিশবে না। একই কাপে কালার চা–র দুই অংশের স্বাদও দুই রকম।

আমরা শ্রীমঙ্গলে রমেশের চায়ের দোকানে পৌছে কালার চা খেলাম। আমার এতো ভালো লাগলো যে, দুবার খেলাম।

চা খেয়ে দোকানদারের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, এ পদ্ধতি তিনিই আবিষ্কার করেছেন। তবে কিভাবে এসব চা তৈরি করেন তা কাউকে জানাতে চান না।

একটু কঠিনভাবে বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না। আপনি যদি এসব চা তৈরির নিয়ম–কানুন কাউকে না জানিয়ে চলে যান, মানুষের হায়াত–মউতের কথা তো কেউ বলতে পারবে না, তাহলে তো এই চায়ের ব্যবসাটা মার খেয়ে যাবে। অন্তত আপনার উত্তরাধিকারীদেরকে জানিয়ে যাবেন, প্লিজ।

আসার সময় গাড়িতে আমি ও শাফি উঠলাম।

কিছুক্ষণ পর শাফি বললো, এই যে আমি তোমাকে নিয়ে এতো ঘুরে বেড়াই। এতো জায়গা–ঘটনা দেখাই, তুমি কখনোই আমাকে থ্যাংকস জানাওনি।

হেসে বললাম, যাও, থ্যাংকস দিলাম, হয়েছে?

শাফি বললো, শুধু মুখের কথায় কি চিড়ে ভিজে?

মানে? জিজ্ঞাসা করলাম।

আরে, থ্যাংকস না দিয়ে তুমি একেকটা জায়গা দেখানোর বিনিময়ে একটা একটা কিস দিতে পারতে।

শাফির দিকে তাকালাম।

শাফি হেসে হেসে কথা বলছিল। আমি কথা বলছি না দেখে শাফি জিজ্ঞাসা করলো, রাগ করেছো? আরে ধ্যত! আমি তো ফান করেছি।

কিন্তু আমার কি হয়ে গেল। আমি চট করে ড্রাইভারকে দেখে নিয়ে হালকা করে শাফিকে কিস করলাম। শাফিও সম্ভবত এটা আশা করেনি।

ও যাতে আমার এ কাণ্ডটাকে অন্য কিছু না ভাবে সে জন্য বললাম, এতো সুন্দর চা খাওয়ানোর জন্য এই উপহার।

শাফি সেদিন খুব সুন্দর করে হেসেছিল।

মৌলভীবাজার থেকে

ভাসমান

– আহমেদ আল সাজিদ

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। সেদিন ছিল বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা। বিকেলে পরীক্ষা দিয়ে যখন বাসায় এলাম তখন প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। পরের দিনই আবার ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা। একটু চাঙ্গা হওয়ার জন্য চায়ের অর্ডার দিলাম। এক চুমুক খেয়েছি, পরের চুমুক দিতে যাবো, দেখি চায়ের মধ্যে কিছু একটা ভাসছে।

পাঠক, শুনতে চান কি ভাসছিল?

দেখি ভাসছে টিকটিকির একটা মরা বাচ্চা।

মাটিকাটা, ঢাকা সেনানিবাস থেকে

কলঙ্কের ছাপ

- মোহাম্মদ সফিকুল আলম

মানুষ যখন কর্মব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনি এক কাপ চা তার ক্লান্তি অনেকটা দূর করে দেয়। কিন্তু সুন্দর এক কাপ চা আমার জীবনে একে দিয়েছে কলংকের ছাপ।

ঘটনা ছিল এ রকম – আমার ছোটখালার বাসায় বেড়াতে গেছি। সময়টা ছিল বিকালবেলা। খালার বাড়ির পেছন দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ধারে মিষ্টি বাতাসে দাড়িয়ে আছি।

উপর থেকে বয়স চল্লিশের একজন লোক এপাড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ি কোথায়? কার বাড়িতে এসেছো? লেখাপড়া করো কোন কলেজে?

একে একে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

শেষে তিনি আমাকে বললেন, তোমার খালু বাসায় আছেন।

বললাম, আছেন।

শুনে তিনি খালার বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। আবার ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে আমাকে বললেন, বাবা, ওপারে পাকা একতলা শাদা বাড়িটা আমার। বেড়াতে এসো খুশি হবো।

ভদ্রতা রক্ষার জন্য বললাম, চেষ্টা করবো।

এরপর তিনি নিজের বাড়ি গেলেন আর আমি খালার বাড়ি চলে এলাম।

পরের দিন সকাল দশটার দিকে খালা আমাকে ওই লোকটির বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ওই লোকটির স্ত্রীর সঙ্গে খালার সাংসারিক অনেক আলাপ হলো, আলাপ হলো আমাকে নিয়েও। এরপর চা, বিস্কিট, নাশতা এনে খেতে বললেন।

আমি শুধু চা–টা খেলাম। চা খেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কারণ এতো ভালো চা কখনো খাইনি। চা শেষ করে বললাম, খালাম্মা, আপনার হাতের চা খেয়ে খুব ভালো লাগলো। সত্যি বলতে কি, এতো ভালো চা কখনো খাইনি।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন, বাবা, এটা আমি বানাইনি, এটা বানিয়েছে আমার একমাত্র মেয়ে বিলাসী (ছদ্ম নাম)।

বললাম, তাকে তো দেখছি না?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি ডাক দিলেন, বিলাসী, এখানে একটু এসোতো মা।

ডাকামাত্রই মেয়েটি এসে হাজির হলো।

তার মা তাকে আরো দুই কাপ চা বানিয়ে দিতে বললেন।

উত্তরে মেয়েটি বললো, মা, চাপাতা ফুরিয়ে গেছে।

এ কথা শুনে মেয়েটির মা বললেন, ঠিক আছে বাবা আরেকদিন এসো, তোমাকে প্রাণ ভরে চা খাওয়াবো।

অনেক সময় হলো। আমার খালা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে সফিক, মেয়েটাকে কেমন দেখলি?

বললাম, এক্সেলেন্ট।

তিনি আরো বললেন, এখন বাড়ি যা, কাল তোর মাকে পাঠাবি। বলবি, জরুরি কথা আছে।

পরদিনই মা তার ছোট বোনের বাড়িতে গেলেন এবং ফিরে এসে আমাকে বললেন, সফিক তোর খালার সঙ্গে ওপারে বেড়াতে গিয়েছিলি শুনলাম।

বললাম, হ্যা মা, গিয়েছিলাম আর ওই বাড়ির একমাত্র মেয়ে বিলাসীর হাতের এক কাপ সুন্দর চাও খেয়ে এসেছি।

মুচকি হেসে মা বললেন, আমিও ওই বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যেমন সুন্দর চেহারা তেমন তার হাতের চা। স্বাদটা যেন ঠোটের সঙ্গে লেগেই আছে।

বললাম, মা, এক কাপ চায়ের স্বাদ কতোদিনই বা লেগে থাকবে।

শুনে মা বললেন, স্বাদটা যাতে চিরদিন পাই সেই ব্যবস্থাই করে এলাম।

বললাম, তার মানে?

মা বললেন, মানে আর কি, তোর সঙ্গে ওই মেয়েটির বিয়ে ফাইনাল করে এলাম। তাড়াতাড়ি কার্ড ছাপানোর ব্যবস্থা কর।

মায়ের কথা শুনে আমি তো অবাক! বলেন কি? সুন্দরী মেয়ের সুন্দর হাতের এক কাপ চা খেয়েই ঘায়েল। একেবারে তাকে ঘরের বৌ করে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। ভালো–মন্দ কিছু জানার প্রয়োজন মনে করলেন না!

আমিও তাড়াতাড়ি বলে দিলাম, মা, আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না। কারণ মেয়েটি বেশি সুন্দরী। আর সুন্দরী মেয়েরা নাকি অহংকারী হয়। তাই কিছু না জেনে তাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মা জেদি মানুষ। যা বলেন তা–ই করেন। যেহেতু বাবা অনেক আগেই গত হয়েছেন সেহেতু মায়ের আদেশ শিরোধার্য।

কয়েকদিন পরই আমার বিয়ে হয়ে গেল, বেশ ধুম–ধামও হলো।

বৌ বাসর ঘরে বসে আছে। পাড়া–পড়শিরা একে একে দেখে গেল। সবাই একই কথা বললো, বৌ তো নয়, যেন পরীর বাচ্চা। ছেলেটা সুখীই হবে।

এক সময় বৌ দেখার পালা শেষ। রাত দশটা হবে। পাশের ঘর থেকে আমার এক পড়শি দাদি আমাকে ডেকে এনে কানে কানে বললেন, বৌ একা বসে আছে, তার সঙ্গে আলাপ কর গিয়ে। আর দরজাটা ভালো করে লাগিয়ে দিস। কেউ যাতে ডিস্টার্ব করতে না পারে। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

তার কথা মতো দরজা লাগিয়ে স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসলাম। তার মুখখানা আমার দিকে ফেরালাম। কিছু বলতে চাইলাম, জানতে চাইলাম।

কিন্তু সে কিছুই বললো না। শুধু নীরবে কেদেই চলেছে।

এক সময় বুঝতে পারলাম বাড়ির সবাই বিছানায় পাশ দিয়েছে।

আমার স্ত্রীও মুখ ধুয়ে শুয়ে আছে।

লাইট অফ করে তার পাশে শুয়ে পড়লাম।

আমার একটি হাত তার দেহের ওপর রাখতেই সরিয়ে দিল।

আবার দিলাম।

আবার সরিয়ে দিল।

মিনতির সঙ্গে বললো, প্লিজ, শুধু আজকের রাতটা আমাকে স্পর্শ করবেন না। কাল থেকে যা ইচ্ছা তাই করবেন।

তাকে আর বিরক্ত করলাম না। পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। তখন ঘড়িতে একটার এলার্ম ছিল। এলার্মের মিউজিকটা ভালো। তাই শুনতে শুনতে কখন যে বিভোর ঘুমে ঢলে পড়েছি বুঝতেই পারিনি। শেষ রাতের দিকে যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন ইচ্ছা হলো আরেকবার তাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করি।

চোখ বন্ধ করেই হাতটি এগিয়ে দিলাম। কিন্তু তার স্পর্শ মিললো না। তাড়াতাড়ি বেডসুইচ অন করে দেখি ঘরের দরজা খোলা। ভাবলাম টয়লেটে গেছে। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু আধা ঘণ্টা পার হবার পরও যখন এলো না তখন টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম টয়লেটের দরজা খোলা। অন্য কোথাও খুজে না পেয়ে বাড়ির সবাইকে ডাক দিলাম।

সবাই উঠে এলো। এদিক–সেদিক খুজতে খুজতে রাত ফর্শা হয়ে গেল। সূর্য উঠলো। কিন্তু আমার পরমা সুন্দরী স্ত্রীর দেখা মিললো না।

হঠাৎ আমার ছোট বোন বিছানা ঠিক করতে গিয়ে একটি চিঠি পেয়ে আমাকে এনে দিল। তাতে লেখা ছিল –

দয়া করে আমাকে খোজ করবেন না। কারণ আজ থেকে দুই মাস আগেই আমার পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে বিয়ে করেছি। তার সঙ্গে রাতও কাটিয়েছি। সবই গোপন ছিল এতোদিন। কেউ জানেনি। কিন্তু আজ জানাতে বাধ্য হলাম। আর আপনাকে স্ত্রীর আদর ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করার জন্য দুঃখিত। পারলে ক্ষমা করে দেবেন।

ইতি

বিলাসী

চিঠি পড়ে মনটা ভেঙে গেল। বিয়ে করলাম। কিন্তু বৌ পেলাম না।

মাত্র তিনটি কবুল করার সুবাদে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রির সঙ্গে আরেকটি ডিগ্রি আমার যোগ হলো যার নাম আমি বিবাহিত। এই ডিগ্রিটা মাথায় নিয়ে পার করেছি দুটি বছর। বর্তমানে সাতাশ বছর চলছে। আমি সুন্দরী মেয়েদের পূজারি ছিলাম না কখনো, আজো নই।

শুধু সুন্দর মনের একটি মানুষের আশায় পথ চেয়ে আছি। জানি না কবে তেমন মানুষের দেখা পাবো।

পরিশেষে বলবো, এক কাপ সুন্দর চা আমার জীবনে যে কলংকের ছাপ একে দিল, অন্য কারো জীবনে যেন তা না ঘটে।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে

প্রিয় বন্ধুরা

- তানজিমা হোসাইন

আমার হাতে প্রথম চায়ের পেয়ালা উঠে আসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি যে, আমাদের বাড়িতে আমার বাবা মায়ের বিন্দুমাত্র চায়ের অভ্যাস নেই। তাই এমন প্রায়ই হয়েছে যে, বাড়িতে অতিথি এসেছে। কেক, চানাচুর, আপেল, কমলা, কোক, ফান্টা সবই দেয়া হয়েছে। কিন্তু চায়ের কোনো নাম নেই।

অতিথি হয়তো অপেক্ষা করেই চলেছেন, বুঝতে পারছেন না। উঠবেন নাকি আরো কিছুক্ষণ চায়ের জন্য অপেক্ষা করবেন! হয়তো আরো কিছু খাবারও এলো। কিন্তু চা আর এলো না। চায়না ক্যাবিনেটে থরে থরে সাজানো নানা আকৃতির বৈচিত্রময় চায়ের কাপ দেখলে কেউ-ই হয়তো বিশ্বাস করবে না এ বাড়িতে চাপাতা নেই।

যাহোক, হলিক্রস কলেজের কঠিন বাধাধরা নিয়মের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কার্জন হলের সবুজ চত্বরে নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গের চেয়েও বেশি স্বাধীন মনে হলো। বড় হয়ে গেছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তাই ঘড়ির কাটা ধরে বাসায় ফেরার তাড়া নেই। যাকে বলে অবাধ স্বাধীনতা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আড্ডার একটা বিশাল গ্রুপ তৈরি হলো। ফার্স্ট ইয়ার। তাই লেখাপড়ার তেমন চাপ নেই।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে দাড়িয়ে আছি। তখনই সেই বিশাল গ্রুপটার কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো চা খাবো কি না। সেই থেকে আমিও সেই আড্ডার দলের অংশ হয়ে গেলাম। সেটাই শুরু। মজু, টিপু, দিয়া, অশোক, সায়ন্ত, রূসী, কাজল, জাহিদ, ঊষা, নাহিদ, টুটুল, সাবু আর আমি। আমরা সবাই ক্লাস শেষ করেই বাড়ি না গিয়ে ঝপ করে আড্ডায় বসে পড়তাম। কেউ উঠতে চাইলে বাকি সবাই তাকে জোর করে বসিয়ে দিতো। কিছুক্ষণ পর পর হকের ক্যান্টিন থেকে ছোট একটা বাচ্চা ছেলে ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে আসতো। কে যে দাম দিচ্ছে, কেউ খবরই রাখতো না। মাঝে মধ্যে অবশ্য সাবু বলতো যে, আপারা বড়লোক, আপারাই দাম দেবে। চায়ের দাম দিতে রাজি থাকলেও আমরা মানে, আপারা কখনোই বন্ধুদের সিগারেটের দাম দিতে রাজি হতাম না।

দিন গড়িয়ে মাস গেল। একদিন শুনলাম, যে চা আমরা এতো আয়েশ করে খাচ্ছি তা নাকি আসলে লাশের গায়ে দেয়া চাপাতা! খুবই ভয়াবহ তথ্য। কিন্তু কেউ গায়ে মাখলো বলে মনে হয় না।

অনেক সাবধান বাণী শোনার পরেও কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। বরং আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আরো বেশি করে চা খেতে লাগলাম। ছোট ছোট সেই কাপে আট দশ কাপ চা-ও রোজ খেয়েছি।

দেখতে দেখতে বছর গড়িয়ে গেল। ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা এলো। এতো বেশি আড্ডা দেয়ার জন্যই হোক কিংবা অতিরিক্ত চা পানের কুফলই হোক, আমাদের আড্ডার সদস্যদের কারোরই পরীক্ষা তেমন ভালো হলো না। সবচেয়ে খারাপ হলো আমার। আমি থারমোডিনামিকস (Thermodynamics) পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি আমার কিছুই মনে পড়ছে না। পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বের হলো তখন দেখি দুটো সাবসিডিয়ারিতেই শূন্য পেয়েছি! কারণ খাতায় কিছুই লিখিনি।

সাবসিডিয়ারি ক্লাস নাকি করার কোনো দরকার নেই। আমি এই অভয় বাণী বিশ্বাস করেই পরীক্ষার হলে গিয়েছিলাম। দেখলাম এটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সব প্রশ্নের আংশিক উত্তর জানি। কি যে হলো, কিছুই লিখতে ইচ্ছা করলো না।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার পরে কিছুদিন খুবই মন খারাপ ছিল। পাস করিনি এ জন্য নয়, মামুন স্যার সবার সামনে বলেছিলেন, প্রেমও করো না, অর্থের অভাবও নেই। তার মানে কোনো সমস্যা নেই। এরপরও কিভাবে দুটো সাবসিডিয়ারিতে শূন্য পেয়েছো?

তখন আমার মনে হয়েছিল মাটি ফাক হোক, আমি ঢুকে যাই।

যাই হোক। বেশিদিন অবশ্য মন খারাপ রইলো না। Failure is the pillar of success এই কথা বার বার নিজেকে বলেই বোধহয় কিছুটা হলেও আবার আনন্দ ফিরে এলো।

আবারও আড্ডা দিতে লাগলাম। কিন্তু এই বার সবারই টনক নড়েছে। কাজেই আড্ডার মূল বিষয় হলো নোট জোগাড় করা এবং ফটো কপি করা। নীলক্ষেতের দোকানগুলো মনে হয় আমাদের কাছ থেকে ফটোকপি বাবদ লাখ টাকা রোজগার করেছে! চা খাই আর সবাই ফটোকপি করা নোটের পাতা উল্টাই। পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিছু হলেও হয়তো লাভ হয়েছে। কারণ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় সবাই আগের চেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে।

দেখতে দেখতে এক সময় মাস্টার্স পরীক্ষারও শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে আশাতীত রেজাল্ট করলাম, যেই আমি থারমোডিনামিকস–সহ দুটো সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় ফার্স্ট ইয়ারে ফেল করেছিলাম সেই আমি মাস্টার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হলাম। কার্জন হলের পাট শেষ হলো।

প্রিয় বন্ধুদের সেই জোগাড় করা নোটগুলোর ফটোকপি না পেলে আমি কোনোদিনই এতো ভালো করতে পারতাম না। মজু আর নাহিদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কার্জন হল থেকে বের হয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে সবাই কে কোথায় চলে গেল, কারো সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রইলো না। সবাই ব্যস্ত চাকরি, সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে। আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে এলাম।

আমার হাজব্যান্ড স্টারবাকস (Starbucks) কফির প্রচণ্ড ভক্ত। তার সঙ্গে আমিও যাই। কতোবার যে ট্রাই করেছি Frapuccino. Cappucino, Espresso, Mocha. কিন্তু কখনোই পাই না কার্জন হলের হকের ক্যান্টিনের সেই আড্ডার গন্ধ আর স্বাদে ভরা অমৃত সমান সেই চা।

ছোট ছোট পিরিচ ছাড়া ভাঙা সেই কাপে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের পাচটা সবচেয়ে মধুর বছর, জড়িয়ে আছে অনেক স্মৃতি, মিশে আছে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুরা।

বন্ধুরা, তোমরা যেখানেই থাকো ভালো থাকো, তোমাদের কথা আমার অনেক মনে পড়ে। I miss you all.

ক্যালিফোর্নিয়া, ইউএসএ থেকে

tanzeema@hotmail.com

তানজিনা

ইউনিভার্সিটি লাইফের পাচটি বছর কেটে গেল। তখন মাস্টার্স পরীক্ষা চলছে। এই পাচ বছরে পাচটা দিনও বোধহয় আমার বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় বসা হয়নি। বাসায় থাকি, বাসা থেকে সোজা ইউনিভার্সিটিতে যাই ক্লাস করতে। ক্লাস শেষে আবার সোজা বাসায় ফিরি। নো ফ্রেন্ডস, নো আড্ডা।

এ এক অদ্ভুত জীবন আমার। আমিই মাঝে মধ্যে অবাক হই যে, পাচটি বছর একটি ইউনিভার্সিটিতে কাটালাম। অথচ একটি ভালো বন্ধু বা বান্ধবীও আমার হলো না!

আমি কি এতোই আনসোশাল?

সেদিন আমাদের বিভাগের এক স্যার কি কথায় কথায় যেন আমার আম্মাকে বললেন, আপনার মেয়ে তো বেশ ভদ্র। কখনো ওকে বাইরে চা–টা খেতে বা ঘোরাঘুরি করতে দেখি না।

কথাটা শোনার পর থেকেই বেশ মজা লাগছে। আমার তো আসলে কোনো বন্ধু নেই বলেই ইউনিভার্সিটিতে চা খাওয়া হয় না। ফ্রেন্ড সার্কেল থাকলে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে মাঠে বসে চা খেতাম এবং আড্ডা দিতাম। একা

তো আর মাঠে বসে চা খাওয়া যায় না! তাই বাধ্য হয়েই আমাকে গ্যাপ টাইমটা লাইব্রেরিতে কাটাতে হয়। তারই ফলস্বরূপ স্যারদের চোখে এই তথাকথিত ভদ্র মেয়ে হওয়া।

মন্দ কি!

রাজশাহী থেকে

লিনডা

- রাজু

১৯৯৭ সাল। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি। আমাদের কেন্দ্র পড়েছিল শহরে। এর আগে শহরে তেমন একটা যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমার।

পরীক্ষার শেষ দিন। আমার বন্ধু মোহনসহ নাশতা করবো বলে ফাস্টফুড ধাচের একটা দোকানে ঢুকলাম।

বেয়ারা পৃন্টেড কাগজে বাংলা অক্ষরে লেখা ইংরেজি নামে তাদের খাবার মেনু দিল অর্ডার করার জন্য।

আমরা দুজনে সবচেয়ে কম দাম পাচ টাকার যে খাদ্যদ্রব্যটি বেছে নিয়েছিলাম তার নাম ছিল লেমন টি।

বেয়ারাকে মোহন বললো, আমাদেরকে দুটো দুটো করে চারটি লেমনটি দাও।

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করলো, এক সঙ্গে?

বললাম, না না, দুই প্লেটে করে আনো।

বেয়ারা আশ্চর্য চেহারায় বলে উঠলো, দুই পিরিচে চারটি চা কি করে আনবো?

তখনি আমার মগজে টোকা পড়লো, আরে! লেমন টি মানে তো লেবু চা! টি উইথ লেমন! আমরা ভেবেছিলাম লেমন টি কোনো বার্গার জাতীয় খাদ্যের নাম হবে।

আমাদের বোকামি টের পেয়েই ওই দিন দোকানের ম্যানেজার এবং বেয়ারার হাসির শব্দ মনে পড়লে আজও আমার লজ্জা লাগে নিজের কাছে।

২০০৩ সাল। সউদি আরবে একটা মাল্টিন্যাশনাল অ্যাড কম্পানিতে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছিলাম। এক সকালে অফিসে টি বয় আমার টেবিলে চা রেখে সবে বিদায় হয়েছে। তখন আমার এক লেবানিজ তরুণী সহকর্মী লিনডা তার প্রয়োজনে আমার সামনে থেকে একটা কাগজ টান দিয়ে নিতে যাচ্ছিল। ঠিক ওই মুহূর্তে আমার প্রাণ ফাটানো চিৎকারে পুরো অফিস স্তব্ধ! কারণ টি বয় চায়ের কাপটা রেখেছিল ওই কাগজের একটি কোণার ওপর।

কাগজে টান দেয়াতে কিভাবে যেন কাপ কাত হয়ে টাটকা গরম চা আমার উরুর ওপর পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমাকে হাসপাতালে নেয়া হলো। যে বস্তু মুখ দিয়ে পান করতে এতো সুস্বাদু, তা স্থানচ্যুত হওয়াতে কি যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা, ও আল্লাহ!

দুই দিন হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর বাসায় চলে এলাম। আমার অন্য সহকর্মীরা আমার সঙ্গে মাত্র একবার করে দেখা করলো। কিন্তু সম্ভবত অপরাধবোধ থেকেই লিনডা আমাকে প্রতিদিন দুইবার করে দেখতে আসতো। দুপুরে আমরা রান্না হচ্ছে না শুনে সে সকালের শিফট শেষ করে তিনটার দিকে আমার জন্য খাবার নিয়ে আমার কম্পাউন্ডে আসতে লাগলো।

আমার বাসায় আসার দ্বিতীয় দিন সে বোরখা খুললো।

এতোদিন আমি শুধু তার মুখমণ্ডল দেখতাম। কিন্তু সেদিন বোরখা খোলাতে তার অপরূপ সৌন্দর্যে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

বলা প্রয়োজন, এখানকার নারীরা পর্দানশিন। কিন্তু বোরখার ভেতর এরা খুবই অল্প এবং পাতলা কাপড় পরে।

লিনডা আমার পাশে বসে আমার কাধে হাত রাখলো। তৎক্ষণাৎ যেন হাজার ভোল্টের কারেন্ট খেলে গেল পুরো শরীরে। নিঃশ্বাসে দ্রুততা আসতে লাগলো। উরুর ক্ষতে ব্যান্ডেজ থাকার কারণে শর্ট প্যান্ট পরেছিলাম। শর্ট প্যান্টের নিচে বন্দী বাঘের হুংকার, লাফালাফি লিনডা টের পেয়ে গেল। তার হাত আমার বক্ষদেশ ছুয়ে জিপারে এসে থামলো।

মৌন সম্মতি পেয়ে ব্যাঘ্র ব্যাকুলতায় ঝাপিয়ে পড়লাম। আমার হাত দুটো হিমালয়ের গঠন প্রণালী আবিষ্কারে মেতে উঠলো।

ওই দিন ছিল বৃহস্পতিবার। আমরা চুটিয়ে আড্ডা মেরেছিলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় সে বিদায় নিল। তার আন্তরিক যত্নে এক সপ্তাহে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। তারপর থেকেই ও সময় পেলে আমার রুমে আসতো।

চায়ে পোড়া কিছু সময়ের যন্ত্রণা আমাকে দিয়েছে মজার এক সুখ বিলাস। লিনডিয়ার মিষ্টি দুটি ঠোঁট গরম চায়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে বার বার।

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

sopnotory@yahoo.com

কৌতুক

- **এম আবদুর রউফ**

চা নিয়ে একাধিক কৌতুক রয়েছে। একটি কৌতুক এ রকম :

এক লোক চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, চায়ের কাপে একটা মরা মাছি। বয়কে ডেকে লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, এই বেটা, চায়ে মাছি কেন? বয় উত্তর দিল, *দুই ট্যাকার* চায়ে মাছি থাকবো না তো কি এরোপ্লেন থাকবো?

দ্বিতীয় কৌতুকটি হচ্ছে, নানা-নাতি ঘুরতে বেরিয়েছে। নাতি জানে না চা কি এবং কিভাবে পান করে। ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের কাছে এসে দাড়ায় দুজন। নাতি হঠাৎ আবিষ্কার করে একাধিক লোক কি যেন চুমুক দিয়ে পান করছে। নাতি অবাক হয়ে নানাকে জিজ্ঞাসা করে, নানা ওরা অইভাবে কি খায়? আমিও খামু?

নানা এক কথায় উত্তর দেন, চা।

নাতি বলে, আমি চাইতে পারুম না, তুমি চাও।

তৃতীয় আরেকটি চা বিষয়ক কৌতুক এ রকম :

সদ্য শহরে এসেছে এক বোকা টাইপের গ্রামীণ লোক। চেনে না কোনো কিছু। শহর সম্বন্ধে নেই ন্যূনতম ধারণা। অনেক বাড়িঘর, বিশাল অট্টালিকা, শ শ রিকশা, গাড়ি ইত্যাদি যতো দেখে ততো অবাক হয়! ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো কিছু না চেনাতে সে কোথায় খাবে সেই সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে সে চলে আসে আদালত পাড়ায়। দেখে একটা রুমের মাঝে অনেক চেয়ার। টেবিলও আছে। সবগুলোতেই লোক বসা।

কৌতূহলী হয়ে সে ভেতরে ঢোকে। দেখে সবার সামনে কিঞ্চিৎ দূরে হোটেল কাউন্টারের মতো এক ভদ্রলোক বসা। তার সামনে কালো পোশাকে দুই ব্যক্তি তর্ক করছে। হঠাৎ সেই ভদ্রলোক হাতে হাতুড়ি নিয়ে টেবিলে ঠক ঠক করে বাড়ি দিয়ে বলছে, অর্ডার অর্ডার।

বোকা লোকটা ভাবলো, উনি বোধহয় তাকে দেখেই অর্ডার অর্ডার বলছেন। তার মধ্যে সহসা কাজ করলো যে ভাবনাটি তা হলো এটা নিশ্চয়ই হোটেল। আর ওই ভদ্রলোক হোটেলের মালিক। তাকে দেখেই বোধ হয় মালিক জানতে চাইছেন সে কি খাবে। তাই অর্ডার অর্ডার বলে খাবারের অর্ডার দিতে বলছেন।

লোকটি তৎক্ষণাৎ এক কোণায় বসে পড়ে হাত উঠিয়ে জোর গলায় বললো, দুইটা সিঙারা, দুইটা পুরি আরেকটা চা।

এ গেল চা নিয়ে বহুল আলোচিত তিনটি কৌতুক। এবার চা নিয়ে একটি সত্যিকারের মজার ঘটনা বলবো।

মন্টু আমার এক বেয়াই, মানে ভাবীর বড় ভাই। আমার সমবয়সী এবং বন্ধু। স্বভাবে সহজ সরল। সে হঠাৎ করেই তার ছোট বোন মানে আমার ভাবীর বাসায় বেড়াতে গেছে। বাসায় তখন অতিথিদের কফি খেতে (মানে পান করতে আর কি) দেয়া হয়েছে। মন্টুকেও আলাদা রুমে এক কাপ কফি দেয়া হলো।

কফির কাপে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে মন্টু বললো, *সেরিনা (ভাবীর নাম), চা তো পুইড়্যা হালাইছস রে!*

ভাবী নয়, উত্তর দিল তার আট বছরের ছেলে, *মন্টুমামা, এইডা তো চা না। এইডা অইল কফি। আর কফির স্বাদ অইরহমই*।

ময়মনসিংহ থেকে

নব আবিষ্কৃত গুণ

–নাহিদ হোসেন নাহিদ

বন্ধু রবিউল এক সময় আমার অফিসে এসে বেশ সমস্যা করতো। কিন্তু এখন আর পারে না। আমাকে তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল এক কাপ চা। সে কথাই বলছি।

কথা বলা যাদের স্বভাব তারা আমাকে বেশ পছন্দ করে। কারণ আমার কাছে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। আমি মন দিয়ে কথা শুনি। কান দিয়ে ঢুকলো কি না তা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বক্তার প্রতি আমার একাগ্রতা চেহারায় ফুটে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

ডেল কার্নেগি অনেকটা এ রকমই বলেছেন। তিনি বিরক্তিকর বিষয়ে বিরক্ত না হয়ে আগ্রহীর ভাব নিয়ে অভিনয় করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ মনে রেখে অভিনয় করে যাই। কিন্তু আমার অভিনয় বুঝতে না পেরে আড্ডাবাজ বন্ধুরা আমার অফিসে এসে সমানে আড্ডা মেরে যায়।

এই আড্ডাবাজ বন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক রবিউল। প্রায়ই সে অফিসে আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। তাতে আমার যে কাজের ক্ষতি হয় তা বুঝতে চায় না। এক গাল হেসে রুমে ঢুকবে। আবহাওয়া নিয়ে কিছুক্ষণ খিস্তিখেউর করবে। প্রকৃতিতে যে একটা মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে এবং মহা প্রলয়ের আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে সে সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাত্ত্বিক বক্তব্য দেবে।

শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বৃষ্টিপাত কোনোটাই সে সহজভাবে নিতে পারে না। শীতকালে বলে, এখন তো শীতের দরকার নেই, বরং গরমকালে শীতটা পড়লে মানুষের বেশ কাজে আসতো। আবার গরমকালেও তার অভিযোগ। গরমকালে গরমের দরকারটা কি? শুধু তাপের অপচয়।

কি বলিস, ঠিক বলিনি? রবিউল তার যুক্তির সমর্থন চায়।

বলি তা ঠিক, তা ঠিক। তবে কি না, স্রষ্টার রহস্য বোঝা বড় কঠিন।

আমার কথা শুনে সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। রাখ তোর স্রষ্টার রহস্য। সব দোষ আমাদের। আমরাই প্রতিনিয়ত পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করে যাচ্ছি। মরণ, বুঝলি, আমাদের মরণ আমরাই ডেকে আনছি।

সে তার এ বক্তব্যের সূত্র ধরে এক সময় চলে আসে নিজের ব্যক্তিগত জীবনাচার সম্পর্কে আলোচনায়। যাকে বলে জীবন জিজ্ঞাসা। কিন্তু তার জীবন জিজ্ঞাসা ধর্মী বক্তব্যের সারমর্ম বোঝার আগেই সে চলে যায় দেশীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি, দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ এসব আলোচনায়।

মনে হয় সে যেন বিশ্ব জ্ঞানের এক জীবন্ত ক্যাসেট।

এক সময় আবিষ্কার করি, সে দেশে নেই। সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইরাকে কেন আমেরিকানরা আক্রমণ করলো, উত্তর কোরিয়ার এটম বোমা তৈরির যৌক্তিকতা কি, ইরান-সিরিয়ার ভবিষ্যৎ, সভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙার কারণ ও ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে সে বিরতিহীনভাবে আমাকে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে, আর আমি জ্ঞানী হয়ে উঠছি।

এ ধরনের সর্বজ্ঞের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসার কথা। কিন্তু আমার মনে শ্রদ্ধা জাগে না, বরং মেজাজ খিচড়ে যায়।

রবিউলের উপদ্রব যখন চরম পর্যায়ে, আমি এ আপদ থেকে মুক্তির পথ খুজছি, ঠিক তখনই আমার মুক্তিদাতা হিসেবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল এক কাপ চা।

একদিন রবিউল আমার সামনে চেয়ারে বসে গল্প করছে। তার আক্ষেপ, সে একজন বড় মাপের লেখক হয়েও কিছু করতে পারছে না। যে বিষয়েই লিখতে যায়, দেখে সে বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ আগে লিখে বসে আছেন। তার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের জন্ম না হলে সে বাংলা সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী কবি হতে পারতো।

তার এ ধারণার প্রমাণ হিসেবে তার লেখা এক ডজন পদ্য আমাকে শুনতে বাধ্য করলো।

আমার মেজাজ খিচড়ে আছে। মনে মনে বললাম, চুপ থাক বে-আক্কেল। মুখে বললাম, এক কাপ চায়ের কথা বলি।

আমার চায়ের কথা শুনে সে চমকে উঠলো, আরে না না, চা লাগবে না। ইশ! অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম। আমারও অনেক কাজ পড়ে আছে। এখন যাই। আবার দেখা হবে। তখন আমার লেখা কিন্তু ...।

তার সব কথা বুঝতে পারলাম না। তার আগেই সে নিষ্ক্রান্ত হলো।

রবিউলের এ আচরণে অবাক হয়ে গেলাম। চায়ের অনেক উপকারিতা সম্পর্কে জানি। কিন্তু এমন উপকারিতা এবং দ্রুত অ্যাকশন কল্পনাই করা যায় না। ঘটনা বুঝে চমকিত হলাম। সকল খাওয়া-দাওয়ার পরেই হয় চা পর্ব অর্থাৎ অতিথি আপ্যায়নের শেষ পর্বই চা পর্ব। তার মানে কাউকে চা আপ্যায়নের মাধ্যমে নির্বাকভাবে বলে দেয়া হয় - নিষ্ক্রান্ত হোন।

চায়ের গুণাগুণ সম্পর্কে এই নব আবিষ্কারের আনন্দে আমার ঠোটের ফাক দিয়ে চিকন হাসি খেলে গেল।

এই ঘটনার পর অনেক বড় বড় আড্ডাবাজ আমার অফিসে এসেছে। কিন্তু কেউ পাচ-দশ মিনিটের বেশি টিকতে পারেনি।

কারণ আমার কাছে আড্ডাবাজ তাড়ানোর মহৌষধ - *এক কাপ চায়ের কথা বলি*।

কুমিল্লা থেকে

খাওয়া

-মোজাম্মেল মোমিন

আমরা জানি যা চিবিয়ে খাওয়া হয় তা-ই কেবল খাওয়া। প্রশ্ন হলো, আমরা কি চা চিবিয়ে খাই? না, আমরা চা পান করি। যদি চা পান করি তাহলে খাওয়ার কথা কেন আসবে?

উদাহরণ দিয়ে বলি, বন্ধুকে বলি চা খাবি? ভাইকে বলি, চা খাবেন? আম্মা জিজ্ঞাসা করেন চা খাবি? বলি খাবো। স্ত্রী স্বামীকে বলে, চা চলবে? স্বামী উত্তর দেয়, হ্যা চা খাবো ইত্যাদি। এভাবে আমরা চা খাওয়ার কথা বলি। এমন কি চা খাওয়ার সঙ্গে পানিও খাওয়ার কথা বলি।

আমি এখন সউদি আরবে আছি। সউদি আরবে এসে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক বেশি চা (পান করি) খাই।

এখানে এক কাপ চা এক রিয়াল অর্থাৎ বাংলাদেশি ১৬ টাকার মতো।

বাংলাদেশিদের এই চা খাওয়া নিয়ে ইনডিয়ান লোকেরা হাসিঠাট্টা করে।

একদিন ইনডিয়ান রেস্টুরেন্টে গেলাম।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কেয়া চাইয়ে?

বললাম, চা চাইয়ে।

ওই ইনডিয়ান আমাকে বললো, কিউ তোমহারা বাঙালি আদমি চা খাতায়ে পানি খাতায়ে বাত করে। অর্থাৎ কেন বাঙালিরা চা খাওয়া, পানি খাওয়ার কথা বলে।

সেই দিন লজ্জাই পেলাম। কারণ আমিও বাঙালি। পরে সেই ইনডিয়ানকে বুঝিয়ে বললাম, বাঙালিরা বলার সময় চা খাওয়ার কথা বলেও লেখার সময় চা পান করার কথা লেখে।

আমরা চা পান করি, এ কথাটাই সত্য। তাই বলা এবং লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য চাই। কলকাতায় অবশ্যই চা পান করার কথা বলে, আমরাই কেবল খাওয়ার কথা বলি। সুতরাং এখন থেকে বলবো চা পান করি।

সউদি আরব থেকে

কমল রস

–নির্জন

ইংরেজ জামানায় যখন এ দেশে বিনা পয়সায় চা পানের প্রচার চলছে তখন আমাদের বংশের এক পূর্বপুরুষ চা পানে *চাতাল* হয়ে, চা বাগানের কুলির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র বলেছিলেন, *মদ খেয়ে মাতাল আর চায়ের নেশায় চাতাল।*

আমার তরুণী মায়ের হাতে চা খেয়ে আব্বু তার প্রেমে পড়েছিলেন। এখন মায়ের প্রতি প্রেম আছে কি না জানি না। তবু তার হাতে বানানো চা ছাড়া আব্বুর সকাল-বিকেল বিষাদ।

মায়ের ব্যস্ততা কিংবা অনুপস্থিতিতে আমি চা তৈরি করি, মুখে না বললেও বুঝি, সেটি মায়ের হাতের চা হয়নি। আমাদের বাসায় এলে অনেকে মায়ের হাতের তৈরি চা খেতে চান।

পথে-ঘাটে চায়ের বিস্তার আর ব্যবসা দেখে মাকে বলি, চলো, আমরা একটা চায়ের দোকান খুলে বসি।

চা নিয়ে লিখতে হবে ভেবে আমি অবাক! কারণ নিজে চা পান করি না।

বইপত্তর ঘেটে দেখি চায়ের অপকারের চেয়ে উপকারিতাই বেশি। যারা ডাইলখোর তারা অধিক চিনির চায়ের মাহাত্ম ভালো বোঝেন। অনেকে ক্ষিধে মারার জন্য অতিরিক্ত চা পান করেন। নেহেরুর আমলে বিখ্যাত বাগ্মী, কূটনীতিক ও স্বাধীন ভারতের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভি.কে কৃষ্ণ মেনন দিনে একশ কাপ চা খেতেন। ফলে প্রবল আনোরেক্রিয়ায় ভুগে একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েন।

অর্থোপিডিশিয়ানরা বলেন, চায়ে ক্যাফিন পাওয়া যায় যেটা নিষিদ্ধ। অন্য পাচটা নেশার বস্তুর সঙ্গে এর কোনো তফাত নেই। একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেয়ার জন্য চা-ই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, চা হচ্ছে *দ্রবীভূত আহ্লাদ*। কবি শান্তিনিকেতনে একটি চা-চক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ নিয়ে একটি গানও রচনা করেন –

চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক দল
চলো চলো চলো হে।
টগবগ উচ্ছল কাথলিতল-জল
কল কল হে ...।

কাজী নজরুল ইসলামের চা আর পান–এর আড্ডা তো বিখ্যাত হয়ে আছে। আমাদের বড় দুই কবি মদের চেয়ে চায়ের মধ্যেই আনন্দ খুজে পেয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, *চা পান করলে নেশা না হোক, চা পানের নেশা হয়*।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় চা পানের বিরোধিতা করে গেছেন। তিনি চায়ের নামকরণ করেছিলেন Aqua Pura। বলতেন, *চা পান বিষ পান*। মজার ব্যাপার, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক মগ চা না হলে তার চলতো না।

চায়নিজ কবি লো তুংয়ের ছন্দে লেখা চায়ের প্রশস্তি শুধু চায়না দেশে নয়, অনেক দেশে জনপ্রিয় হয়। অনূদিত হয়েছে অনেক ভাষায়। এটি বাংলাতে *চায়ের পেয়ালা* নামে কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চায়ের ব্যাপারে খুতখুতে স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রদোষচন্দ্র মিত্র যার পরিচিত নাম *ফেলুদা*। কার্সিয়াং–এর মকাইবাড়ি টি এস্টেটের চা তার পছন্দ। ফেলুদার গুরু শার্লক হোমস চায়ের ভক্ত। তার পছন্দ সিলোনের (শ্রী লংকা) চা। নীহাররঞ্জন গুপ্তের গল্পে কাজের লোকটি প্রায়ই *ধূমায়িত চা* এনে হাজির করতেন। বাস্তবে চায়ের ধুয়া খুজে পাওয়া ভার।

ঢাকা শহরের অলি–গলিতে ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি করে নানান বয়সের হকার। ঝুপড়ি ঘরের তো অভাবই নেই। সারা দিন অবিরাম যে চা পান করেছেন মানুষ, এগুলো কি আসলে সঠিক চা? অনেকে মনে করেন, এসব চায়ের সঙ্গে মেশানো হয় চামড়ার কুচি, পেপে, নিসিন্দার শুকনো পাতা, কাঠের গুড়া।

অনেক বড় বড় দোকানে দেখি, চায়ের সঙ্গে পাকা কলার এবং টোস্টের গুড়া মেশানো হয়।

চা–তে ভেজাল ধরার দুটি উপায় বলি। চুম্বক ধরলেই লোহার গুড়া আছে কি না ধরা যাবে। আলগা রঙ করা থাকলে তা ধরার জন্য ফিলটার পেপারের ওপর কয়েকটি চাপাতা রাখতে হবে। এবার পানি ছিটিয়ে কাগজ ভিজিয়ে দিলে ভেজাল রঙ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে রং ধরবে। এছাড়া কাচের পাত্রে ভেজা কলি চুনের ওপর চাপাতা বা চায়ের গুড়া ছড়িয়ে দেয়ার পর যদি লাল কমলা বা ওই ধরনের কোনো রঙ দেখা দেয় বুঝতে হবে ভেজাল আছে। বিশুদ্ধ চাপাতা থাকলে সবুজ, হলুদ, আবছা রঙ কিছুক্ষণ বাদে দেখা দেবে।

ভালো করে ফোটানো গরম জলে তিন মিনিট চাপাতা ভিজিয়ে অল্প দুধ এবং অল্প চিনি দিয়ে খান, চায়ের সঠিক স্বাদ পাবেন। চিনি বেশি দিলে ক্যালরি বাড়বে। দুধ বেশি দিলে স্বাদ কমবে। দুধ আর চা পাতা এক সঙ্গে ফোটাবেন না। আলসারের রোগীর দুধ ছাড়া চা খাওয়া ভালো। কারণ এসিডিটি যদি হয় তার জন্য দায়ী দুধ, চা নয়। অনেকে লেবু চা ভালোবাসেন। তাতে স্বাদ, গন্ধ একটু বদলায় মাত্র। আর কিছু নয়।

উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার একদল গবেষক কিছু নারীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যারা দীর্ঘ দিন আধা কাপ চা পান করে এসেছেন তারা অতি সহজে গর্ভবতী হয়েছেন। কারণ চা–য়ে উপস্থিত পরিফেলন ও জেনথাইনস গর্ভধারণে সাহায্য করে। নেফ্রোলজিস্টরা কিডনি, হার্টের অসুখে দুধ চা খেতে বারণ করেন। বিশেষ করে যারা কিডনির সমস্যায় ভুগছেন তাদের লেবু চা একেবারেই নয়।

চায়ের ইতিহাস নিয়ে নানান রকম লোককথা, উপকথা আছে। এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধের তপস্যা করছিলেন। ধ্যান করতে করতে একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। এক সময় তিনি ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙতেই অনুতাপ হয়। ধিক্কার জন্মায়। রাগে–দুঃখে তিনি নিজের চোখের পাতা কেটে ফেলেন। কথিত আছে, ওই চোখের পাতা থেকেই চায়ের উৎপত্তি। এর থেকে একটা বিশ্বাসও তৈরি হয়েছে যে, চা খেলে ঘুম আসে না।

প্রভাত রঞ্জন সরকারের লেখা দিয়ে চা বন্দনা শেষ করি। কে বলে চায়না আমাদের চা খেতে শিখিয়েছে? দুর্গম গিরি পেরোনোর সময় ইনডিয়ান সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকরা অন্তত পাচ হাজার বছর ধরে হিমালয়ে চা উপভোগ করেছেন। অবশ্য পানীয় হিসেবে নয়। তখন দুর্গম পথের যাত্রীরা শীত জয় করার জন্য চায়ের পাতা চিবিয়ে খেতেন।

পরবর্তীকালে সংস্কৃতে চায়ের নাম হয় *কমল রস*। যারা সাহেবদের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত এ দেশের ঐতিহ্যের কিছুই বিশ্বাস করেন না তাদের কাছে সবিনয় নিবেদন, বোটানির বড় বই খুলে চায়ের পোশাকি নামটা একটু ভালো করে দেখুন Camellia Sinensis। *কমল* কথাটি *ক্যামেলিয়া* শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে নেই? কট্টর স্বদেশিরা যদি পাচ হাজার বছর আগের দুঃসাহসী ইনডিয়ান গিরিলঙ্ঘনকারীদের স্মরণে রেখে চা-কে *কমল রস* আখ্যা দেন তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

শুরুতে লিখেছিলাম আমার মায়ের তৈরি চা ছাড়া আব্বুর চলে না। আব্বুর নাম *কমল*। আমার মা গত পচিশ বছর ধরে *কমল রসে* মজে আছেন। এও যেন চায়ের নেশার মতোই।

cancer.compaign@gmail.com

হায় এখন

-রাকিব আহমেদ

ইউনিভার্সিটিতে চা ছাড়া আমার একদিনও চলতো না। ও চা পছন্দ করতো না, পছন্দ করতো আমাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে আড্ডায় বসার অর্থ হলো আমি চা অফার করবোই।

আমার অফার ফেরানোর ক্ষমতা তো তখন ওর ছিল না।

ধরার যায়গায় না ধরে আমি ধরতাম সরাসরি গরম কাপে। আমার গরম লাগতো না। আমার অনুকরণে ধরতে নিয়ে একদিন গরম চা ফেলে, কাপ ভেঙে একাকার।

অবশেষে ও চায়ে অভ্যস্ত হয়ে গেল।

আমি অভ্যস্ত হলাম ওর চুলের গন্ধে।

হায়, এখন ...

আমাকে ছাড়তে পারলেও শুনেছি চা ছাড়তে পারেনি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

rakiib2002@yahoo.com

বস্থা করতে বললাম, না হয় পরদিন ক্যান্টিন বন্ধ করে দেবো বলে হুমকি দিলাম।

আমি কোনো রাজনীতি করতাম না, ক্যাম্পাসে ভদ্র ছেলে বলে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার এ আচরণে ম্যানেজার দারুণ মর্মাহত হলেন।

ক্যাম্পাস থেকে আমার বিদায়ের আগের দিন বিকেলে ম্যানেজার নিমন্ত্রণ জানালেন ক্যান্টিনে।

গিয়ে দেখি ক্যান্টিন ভর্তি হলের ছেলেরা দাড়িয়ে আর আমার জন্য শুধু একখানা টেবিল চেয়ার এবং এক কাপ 'র'টি। ঘটনায় হতবাক হয়ে যাই।

ম্যানেজার পূর্ব ঘটনার জের টেনে বিদায় জানাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বিষয়টি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মিরপুর, ঢাকা থেকে